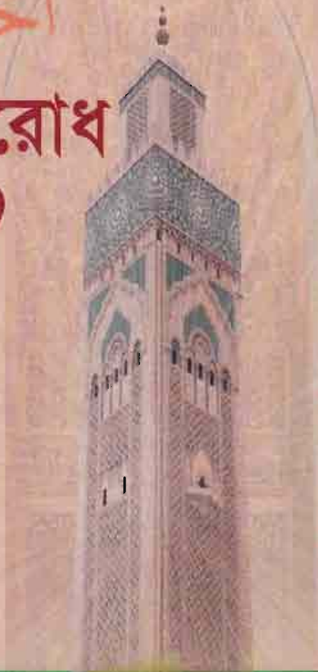
اختلاف الأئمة

ইমামগণের মতবিরোধ কি ও কেন?





শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা

মুহাম্মাদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী রহ.

اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّة

ইমামগণের মতবিরোধ কি ও কেন ?

(কুরআন হাদীসের আলোকে ইমামগণের মতবিরোধের কারণ এবং এ মতবিরোধ কি ও কেন? এ বিষয়ে এক অদ্বিতীয় কিতাব। এ কিতাবটি হাদীস ও মাসয়ালার কিতাব পড়ার পূর্বে পড়ে নিলে কিতাব বুঝতে বড় সহায়ক হয়)

মূলঃ

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী রহ.

হাদীসের উৎসঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আফ্‌ফান মানসূরপুরী দা.বা.

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক হায়বাতপুরী দা.বা.

আনুবাদঃ

মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াছ

মুহাদ্দিস, ইদারাতুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া, ঢাকা।

মুফতী, জামেয়া ইসলামীয়া দারুল ইসলাম, মিরপুর -১, ঢাকা।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুয যাকারিয়া

ব্লক-ডি, রোড-২০, বাসা-৩৪,

মিরপুর-৬, ঢাকা, ০১৭১২ ৯৫৯৫৪১

অনুবাদ ও প্রুফ সম্পাদনায় সহযোগীঃ
মুফতী মুহাম্মাদ দেলওয়ার হুসাইন সাহেব
মুহাদ্দিস, ইদারাতুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া, ঢাকা।

প্রকাশকঃ মোঃ আবরার
মোবা-০১৭১৮ ৭১৭০৯৩

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টম্বর, ২০১১ ঈ

নির্ধারিত হাদীয়াঃ ৬০ (ষাট) টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুর রহীম, ইসলামী টাওয়ার (আণ্ডারগ্রাউণ্ড)
দোকান নং-১৪, বাংলাবাজার, মোবা-০১৯৪৪ ২৯৬৫৭৭
একমাত্র পরিবেশকঃ মাকতাবাতুয যাকারিয়া
দারুল উলূম দক্ষিণ খান মাদ্রাসা, লঞ্জনিপাড়া, বৌরা,
দক্ষিণখান, ঢাকা। মোবা-০১১৯৬-২০৪৪৮৮

বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, পূর্ব কাজী পাড়া
কাফরুল, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭১৮-৭১৭০৯৩

আযিযী প্রকাশনী, ১৭১, ফকিরাপুল, ঢাকা-০১৭১২-০২৭১৭৮

আশরাফিয়া লাইব্রেরী, মিরপুর-১০, ঢাকা। ০১৭২৮-৯৬৫৬৬৮

মাকতাবাতুল আযহার, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা। ০১৯২৪-০৭৬৯৬৫

দারুল উলূম আজিজীয়া মাদ্রাসা, তারাপুর, সিংগাশোল,
নড়াইল। মোবা-০১৭১৮-৬০৯৫৪৮

রঘুনাথ পুর জহুরুল উলূম মহিলা মাদ্রাসা,
রঘুনাথ পুর, কালিয়া, নড়াইল। মোবাঃ ০১৭১০-১২৬৩১৮

সূচীপত্র

প্রথম যুগ

বর্ণনার ভিন্নতার কারণসমূহ

দ্বিতীয় যুগ

আছার (সাহাবাদের বাণী) এর ভিন্নতার কারণসমূহ

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. এর সুযোগ্য সন্তান

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ত্বলহা সাহেব দা.বা. এর

বাণী ও দোয়া

আমি এই মাত্র জানতে পারলাম যে, মাওঃ মুহাম্মাদ আফফান ও মাওঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক তারা দুজনে 'ইখতেলাফুল আইম্মাহ' নামক কিতাবের উপর মেহনত করে এই কিতাবে উল্লেখিত হাদীসগুলোর হাওলা বের করে কিতাবের নিচে টিকা আকারে সংযোজন করে দিয়েছে এবং এই কিতাবের আলোচনা ও বিষয়বস্তুগুলোর শিরোনাম দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের এ খেদমতকে কবুল করুন, উম্মতের জন্য উপকারী বানান, তাদের কলমে আরো শক্তি দান করুন, তাদেরকে উম্মতের খেদমত করার তৌফিক দান করুন এবং উম্মতকে তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফি দান করুন। আল্লাহ তা'য়াল তাদেরকে ইখলাসের নেয়ামত দান করে ধন্য করুন, উঁচু সাহসিকতা ও দ্বীনের আরো বেশী খেদমত করার তৌফিক দান করুন। এবং তাদেরকে বদ নযর থেকে হেফাজত করুন, আমীন।

ইতি

মুহাম্মাদ ত্বলহা বান্দলবী

২৪/০৫/১৪২৫ হিঃ

দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নেয়ামতুল্লাহ সাহেব (দা.বা.) এর

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰي سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰي اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

আল্লাহ্ তা'য়ালা দুনিয়া পরীক্ষার কেন্দ্র বানিয়েছেন এবং ভালো-মন্দ, সঠিক-ভুল সকল বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলা চান মানুষ যেন নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথ গ্রহণ করে। তাই সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধির মতো মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। নবীগণকে পাঠিয়েছেন। আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন এগুলো ছাড়া আরো অনেক উপায় উপকরণ দান করেছেন। মানুষের জন্য দলীল প্রমাণ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কিন্তু এর পরও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ অর্থ ঃ মানুষ সর্বদা মতানৈক্যের শিকার হবে তবে ঐ সমস্ত লোক যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করেন তারা ব্যতিত।

সুতরাং দলীল প্রমাণ পরিপূর্ণ হওয়ার পর যে সমস্ত বিধিবিধান দলীল নির্ভর সেগুলোতে মতানৈক্য না হওয়া উচিত। কেননা দলিল সমূহে মতানৈক্যকারীদের একদল হয় প্রশংসিত আরেক দল হয় নিন্দিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ (سورة البقرة-٢٥٣)

অর্থঃ আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। (সুরা, বাক্বারা-২৫৩)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ .

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ (سورة ال عمران-١٠٥)

অর্থঃ আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে-তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। (সুরা, আল ইমরান-১০৫)

এমনিভাবে রহমত প্রাপ্তরা মতানৈক্য থেকে মুক্ত থাকবে, যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ অর্থাৎ মানুষ সর্বদা মতানৈক্যের শিকার হবে তবে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করেন তারা ব্যতিত।

আর যে সকল হুকুম আহকাম দলিল ভিত্তিক নয় সেগুলোতে মতানৈক্য হওয়া আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছানুযায়ী। এধরনের মতানৈক্যে প্রত্যেক দল-ই প্রশংসিত হবে যদি তারা পরস্পরে জুলুম না করে। যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ

الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾ (سورة الحشر-٥)

অর্থাৎ তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (সুরা হাশর-৫) অর্থাৎ এক দল গাছ কেটেছে আর অন্য দল বিরত থাকছে এদের কোন দলকেই আল্লাহ তাআলা ভুল করেছে বলে আখ্যায়িত করেন নি। অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا

لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا (سورة الانبياء-٧٨-٧٩)

অর্থঃ এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলাইমানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করেছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর আমি সুলাইমানকে

সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। (সুরা, আম্বিয়া-৭৮,৭৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা শুধু সুলাইমান আ. কে বুঝ শক্তি দান করার কথা বলেছেন। কিন্তু দাউদ ও সুলাইমান আ. উভয়ের প্রশংসা করেছেন, তদ্রুপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনূ কুরাইযার দিন ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْعَصْرَاِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ

অর্থঃ তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় ব্যতীত আছরের নামাজ না পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলার পর সাহাবাদের এক জামাত বনু কুরাইযায় পৌঁছার আগেই যেহেতু আছরের সময় হল তাই আসরের নির্ধারিত সময়ে তারা আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। আর আরেক জামাত বনু করাইযায় যেয়ে যেহেতু আছরের নামায আদায় করতে বলা হয়েছে তাই তারা নামাজ আদায় করাকে বিলম্ব করে বনূ কুরাইযায় যেয়ে আদায় করলেন। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন, তিনি তাদের কোন জামাতের কাজকে অপছন্দ করেননি বরং উভয় জামাতের কাজকে সঠিক বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد أخطأً فله اجر

(الابانة الكبري لابن بطة- رقم الحديث-٧٠٢، دلائل النبوة للبيهقي-٣١٠٩)

অর্থৎ যদি হাকিম ইজতেহাদ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে তাহলে তার জন্য দুইটি ছাওয়াব রয়েছে। আর যদি ইজতেহাদ করতে যেয়ে ভুল করে তাহলে তার জন্য একটি ছাওয়াব। (ইবানাতুল কুবরা,নং-৭০২, দালাইলুন নবুওয়া, নং-৩১০৯)

আর যদি এধরনের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে এক দল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে তা নিন্দনীয় হবে এবং আল্লাহ তাআলার ঐ বাণীর অন্ত র্ভূক্ত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ অর্থাৎ (মানুষ সর্বদা মতানৈক্যের শিকার হবে) তবে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করেন তারা ব্যতিত। (যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের প্রতি দয়া করা হবে না।)

আর ইমামগণের মতানৈক্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত। উভয় দল প্রশংসিত। তবে যে দল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করবে, চাই তা মৌখিক ভাবে হোক, যেমন অন্য দলকে কাফের ও ফাসেক বলা অথবা কার্যত হোক যেমন প্রহার করা, হত্যা করা, যুদ্ধ-বিগ্রহ করা তারা আল্লাহ তাআলার ঐ বাণীর অন্তর্ভূক্ত হবে, ইরশাদ করেন,

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

(سورة ال عمران-١٩)

অর্থৎ যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত। (সুরা, আল ইমরান-১৯)

কারণ তারা পরস্পরে অন্যায় বাড়াবাড়ি ও বিদ্বেষ পোষণ ও ধর্মের মাঝে বিভক্তি করেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ اِنَّمَاۤ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾ (سورة الانعام-١٥٩)

অর্থৎ নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আয়ালার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। (সুরা-আনয়াম,১৫৯)

ইসলামের দাবিদার অনেক ব্যক্তি এমন রয়েছে যারা শাখাগত এমন বিষয়ে মতানৈক্য করে -যেগুলো ধর্মের বিষয়ে কোন বিভক্তির বিষয় নেই- সেগুলোর কারণে যুলুম, বাড়াবাড়ি ও বিদ্বেষ করে দ্বীনের মাঝে বিভক্তি ও দল ভারি করে থাকে বা করার চেষ্টা করে তখন প্রত্যেক যুগের উলামাগণ সে সকল সন্দেহ দূর করার জন্য এবং উম্মতকে ঐ নিন্দনীয় মতানৈক্য থেকে রক্ষা করার জন্য ইমামগণের পরস্পরের মতানৈক্যের কারণ বলে দিয়েছেন, আবার কখনো এ ব্যাপারে সতন্ত্র কিতাবও লিখেছেন। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালবিয়া কোথা থেকে শুরু করেছেন সে বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. মতানৈক্যের কারণ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে আল্লামা ইবনে

তাইমিয়া (রহঃ) رفع الملام عن الائمة الاعلام নামক একটি কিতাব লিখেছেন যা অনেক প্রসিদ্ধ ও সহজলভ্য । এমনিভাবে কাযী ইবনে রুশদ রহ.' بداية المجتهد' নামক কিতাবে মতানৈক্যের কারণ বর্ণনা করেছেন। আমাদের হিন্দুস্থানের উলামা কেরামের মধ্যে হযতর মাওলানা শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ,) 'حجة الله البالغة' "নামক কিতাবে বিস্তারিত ভাবে মতানৈক্যের কারণ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে একটি সতন্ত্র কিতাবও লিখেছেন।

সাহারানপুরে মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওঃ মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব (রহ.) একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব লিখেছেন, যা দ্বিতীয় বার আমার দেখার সুযোগ হয়নি তারপরও এই কিতাব খানা খুবই উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় হযরতের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ হুবহু সেভাবেই কিতাবটি ছেপে দিয়েছেন। হযরত এ কিতাবে সে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন অধিকাংশ স্থানেই সেগুলোর হাওয়ালা উল্লেখ ছিল না, যদিও হযরতের ব্যক্তিত্বের কারণে সেগুলোর ব্যাপারে কোন দুর্বলতা ছিল না কিন্তু তদুপরি সে সকল হাদীসের উৎসস্থল ও হাদীসের কিতাবের হাওয়ালা এই কিতাবের উপকারীতা ও নির্ভর-যোগ্যতার ব্যাপারে বর্তমান যুগের একটি আবশ্যকীয় দাবী ছিল।

সেই প্রয়োজন অনুভব করে স্নেহের মাওলানা মুহাম্মাদ আফফান ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক (দা.বা.) -যারা দারুল উলুম দেওবন্দের تخصص فى الحديث (হাদীস বিভাগ) অধ্যায়নরত রয়েছে তাঁরা- সে সমস্ত হাদীসের উৎসস্থল বের করে এই কিতাবে সংযোগ করেদিয়েছে, যদিও এটা তাঁদের ছাত্রাবস্থার কাজ তারপর এটা এমন সুন্দর ও উত্তম হয়েছে যা দেখলে মনে হবে যে, ইহা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে ইলমী উন্নতি ও লেখা-লেখির শক্তি বৃদ্ধি করে দিন এবং তাঁদের এই কাজকে ব্যাপকভাবে কবুল করে এটাকে উভয় জগতের সৌভাগ্যের ওসিলা বানান, আমীন।

(মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা) নেয়ামাতুল্লাহ (দা. বা.)
খাদেম দারুল উলুম দেওবন্দ
১০ জুমা' সানী ১৪২৫ হিঃ

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম, বংশ ঃ শায়েখ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া বিন মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া বিন মাওলানা ইসমাইল বিন সিদ্দীকী কান্দলভী।

জন্ম ঃ ১৩১৫ হিঃ ১১ই রমযান মুতাবেক ১৮৯৮ খ্রীঃ ২রা ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার ইলমের কেন্দ্রস্থান 'কান্দালা' (জেলা মুযাকযার নগর, ইউপি) এর পুরাতন ও প্রসিদ্ধ ইলমী বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যা দাওয়াত ও তাবলীগের খুব প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

শিক্ষা-দিক্ষা ঃ কুরআন মজীদ, বেহেশ্‌তী জেওর ফারসীর প্রাথমিক কিতাবসমূহ ও দ্বীনী কিতাবী নিজ চাচা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস সাহেব কান্দলবী (রহ.) (মৃত্যু ১৩৬৪ হিঃ) এর নিকট পড়েন। আরবীর প্রাথমিক কিতাবগুলো পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেব (রহ.) এর নিকট পড়েন। এরপর আরবী মাধ্যমিক কিতাব পড়ার জন্য ১৩৬৯ হিঃ সনে জামেয়া মাযাহিরুল উলুম সাহরান পুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যেখানে তিনি অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজনদের তত্ত্ববধান ছাড়াও নিজ পিতা এবং বিশেষ মুরুব্বী হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহরানপুরী (রহ.) (মৃত্যু ১৩৪৬ হিঃ) থেকে বিশেষভাবে ফয়েয হাসিল করেন। তিনি ১৩৩৪ হিজরীতে জামেয়া মাযাহিরুল উলুম থেকে ফযীলতের সনদ হাসিল করেন।

শিক্ষাদানঃ শায়েখ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ.) ফারেগ হওয়ার পর পরই ১৩৩৫ হিজরী ১লা মুহাররম মাসে মাসিক ১৫ রুপি ভাতায় মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় প্রাথমিক স্তরের উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ পান। সেখানে চেষ্টা ও মেহনতে মাত্র দশ বছরেরও কম সময়ে ১৩৪৫ হিজরীতে শায়খুল হাদীসের মতো সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করেন। সে বছরই তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় সফর করে নিজ শায়েখ হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর কাছে বায়আত করার অনুমতি পান, খেলাফত পান।

হাদীস শাস্ত্রে যোগ্যতা ঃ শায়েখ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ.) জামেয়া মাযাহিরুল উলূমে থাকাকালীন হাদীস শরীফের যে উত্তম খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা কারো কাছে অস্পষ্ট নেই। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর যোগ্যতা নিম্নোক্ত কথা দ্বারাই ভালোভাবে আনুমান করা যায়, তিনি মাযাহিরুল উলূমে ধারাবাহিক ৪৩ বছর হাদীসের দরস দান করেছেন। তখন তিনি আবু দাউদ প্রায় ৩০ বার, বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ২৫ বার এবং পূর্ণাঙ্গ বুখারী শরীফ ১৬ বার দরস দান করেছেন। এগুলো ছাড়া দীর্ঘদিন মেশকাত, নাসায়ী, মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ, মুওয়াত্তা মালেকসহ অন্যান্য কিতাবের দরস দান করেছেন। শায়েখ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ.) এ যোগ্যতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত দাতা হওয়ায় ১৩৭০ হিজরী থেকে ১৩৮২ হিজরী পর্যন্ত মাদ্রাসার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলূমের মজলিসে শুরার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

ইন্তেকাল ঃ ২রা শা'বান হিজাযী (১লা শা'বান হিন্দী) ১৪০২ হিজরী মুতাবেক ২৪ মে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। সেখানেই নিজ শায়েখ মাওলানা খলীল আহমাদ সাহরানপুরী (রহ.) এর পাশে জান্নাতুল বাকীতে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মাওঃ শাব্বীর আহমাদ যাযাবী কান্দলবী (রহ.) "دردنامۂ حسرت" নামে শায়েখ (রহ.) এর দীর্ঘ একটি কবিতা পেশ করেন, যে কবিতায় তিনি পংক্তির প্রথম অংশে হিজরী ও দ্বিতীয় অংশে খ্রীষ্টাব্দ সনের দিকে ইশারা করেছেন,

شیخ کامل در بقیع اباد باد   در حضور شوق دلھا شاد باد

১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ   ১৪০২ হিজরী

(دردنامۂ حسرت ص-۳۱)

শায়েখের ইন্তেকালের তারিখ "عبد مغفور" (১৪০২ হিঃ) থেকে বুঝা যায়।

ভূমিকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَاٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَتْبَاعِهٖ وَحَمَلَةِ لِلدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

মাযাহিরে উলূম মাদরাসার পক্ষ থেকে ১৩৪৬ হিঃ রমযান মাস হতে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক ও জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর এর মুফতী মাওলানা জামিল আহমাদ সাহেব দাঃ বাঃ এর তত্ত্বাবধানে মাসিক 'আল মুযাহের' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। তাঁর অনেক পিড়াপিড়ির পর আমি নিজে অযোগ্য ও অক্ষম হওয়া স্বত্বেও ইমামগণের মতানৈক্যের বিষয়ে সে পত্রিকায় একটা লেখা দিতে থাকি, যতদিন পর্যন্ত তা প্রকাশ হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত নিজের অনেক ব্যস্ত তা থাকা স্বত্বেও প্রত্যেক মাসে তাতে দুই-চার পৃষ্টা করে লিখতে ছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির কারণে প্রায় ১৩/১৪ মাস পর উক্ত পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় ফলে আমার উক্ত বিষয়ও প্রকাশ করা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যদিও অনেক বন্ধুবান্ধব ও বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলি উক্ত বিষয়টি পরিপূর্ণ করার প্রতি পিড়াপিড়ি করতে থাকেন, আর মাওলানা জামিল আহমাদ সাহেব যেহেতু একই মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন এবং সর্বদা কাছেই থাকতেন সেহেতু বারংবার তাগাদা করে কিছু লিখিয়ে নিতেন, কিন্তু পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমার আগ্রহ ও বন্ধুবান্ধবের পিড়াপিড়ি সত্ত্বেও তা পূর্ণ করার সুযোগ হয় নি। ইচ্ছা ছিল তাতে অনেক বিস্তারিত ও অন্যান্য বিষয় বস্তু জমা করার। কিন্তু ইলমী ব্যস্ততা ও লেখা-লেখি বাড়তেই থাকে, এ জন্য তা পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। কোন কোন বন্ধু এ ব্যাপারে পিড়াপিড়ি করল যে, যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে ততটুকুই প্রথম খন্ড হিসেবে ছাপানো হোক। উক্ত বিষয়ের বিষয়বস্তু একেবারেই সংক্ষেপ ও অপূর্ণাঙ্গ ছিল তাই আমার খেয়াল হলো যে, আরো কিছু অংশ হলে ছাপানো হবে, কিন্তু বর্তমানে তো সে ইচ্ছাও নেই। কেননা বিভিন্ন অসুস্থতা আমাকে একেবারেই মাযূর ও বেকার বানিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় স্নেহের মাওলানা শাহেদ ও আমার অন্যান্য ঘনিষ্ট বন্ধুবর্গ পিড়াপিড়ি করলেন যে, যতটুকু লেখা হয়েছে ততটুকুও ফায়দা থেকে খালি নয়, তাই স্নেহের মাওলানা শাহেদ তা ছাপানোর ইচ্ছা করেলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বরকত দান করুন, উম্মতকে উপকৃত করুন এবং স্নেহের শাহেদকে উভয় জাহানে উন্নতি দান করুন, আমীন।

وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

(হযরত মাওলানা) মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ.

১৫ জুমাদুল উলা ১৩৯১ হিঃ

কিতাবটি সংকলনের কারণ

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ ও সালাম। অনেক দিন যাবৎ এই প্রশ্ন মন থেকে মুখে এসে যেত যে, মুজতাহিদ ইমামগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ দ্বারা দলিল পেশ করেছেন তখন তাঁরা পরস্পরে কেন মতানৈক্য করেছেন? বিশেষ করে তর্কযুদ্ধে এবং মতানৈক্য পূর্ণ মাসআলাগুলোর ব্যাপারে অনেক কিতাব প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ায় উক্ত প্রশ্ন আরো শক্ত রুপ ধারণ করেছে। এমন কি প্রশ্নকারীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাদের এক দল মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাপারে খারাপ ধারণায় এমন ভাবে লিপ্ত রয়েছে যে, নিজেদের সুধারণার ফলে যদিও সে খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত হতে চায় কিন্তু তাদের সামনেই মুজতাহিদগণের কথার স্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত মনে হওয়ায় তা থেকে মুক্ত হতে পারে না। অন্য দল এর চেয়ে ও একধাপ এগিয়ে তারা মুজতাহিদ ইমামগণকে বাদ দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও এই ধারণা পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এরকম আবার কখনো অন্য রকম কথা বলেছেন।

অথচ বাস্তবতা হলো এই ভ্রান্তি উর্দূ ভাষায় অনুবাদকারীদের। কেননা কথা বুঝার জন্য তাদের যোগ্যতা ও ভুমিকা জানা, মনোযোগী হওয়া, মেধাবী হওয়া আবশ্যক, অথচ এগুলো তাদের নেই। শুধু মাত্র শব্দের অর্থ সামনে আসার কারণেই এ সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই মতানৈক্যের কারণে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পরস্পরের মাঝে দল ভারি করার উদ্দেশ্যে তর্কে লেগে থাকে। এক দল উযু করলে অন্য দলের কাছে তা বাতিল। এক দল নামায আদায় করলে অন্য দলের নিকটতা ফাসেদ বলে গন্য হতে লাগল। হজ্জ, যাকাত, সওমসহ সকল ক্ষেত্রেই মতানৈক্য বৃদ্ধি পেতে লাগল ও এক পর্যায়ে এ মতানৈক্য ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

এ জন্য, মতানৈক্যের মূল ভিত্তি প্রকাশ করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল, আর ইসলামের প্রথম যুগ হতেই মতানৈক্যের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে এ বিষয়ে সর্তক করার প্রয়োজন হলো যে, মূলত বর্ণনার ভিন্নতা নয়

যার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুউঁচু মর্যদার ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হতে এবং তাঁর পরবর্তী সাহাবা তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগনের ব্যাপারে বেয়াদবী করার সুযোগ হবে, বরং সমস্ত মুজতাহিদই সিরাতে 'মুসতাকিমের' পথ প্রদর্শক ও আহবানকারী ছিলেন। আর তাদের ব্যাপারে বেয়াদবি করা মাহরুম ও বঞ্চিত হওয়ার আলামত, এগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রায় চাই

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। কিন্তু হায় যদি এর জন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি কলম ধরতেন তাহলে ভাল হত অন্যথায় আমার অসম্পূর্ণ লেখা উক্ত বিষয় বস্তু সমাধান করার পরিবর্তে -আল্লাহ না করুন- আরো ঘোলাটে না হয়ে যায়।

আমি 'আল-মুযাহের' এর উপদেষ্টাগণের কাছে ওযর পেশ করেছি। কিন্তু এরপর ও সীমাতিরিক্ত পিড়াপিড়ির কারণে নিজ অযোগ্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজে এ সামান্য কিছু লিখেছি।

উক্ত মতানৈক্য তিনটি যুগে হয়েছে,

প্রথমঃ হাদীসের মতানৈক্য। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও কর্মে বাহ্যত যে মতানৈক্য বুঝা যায়।

দ্বিতীয়ঃ সাহাবাগনের আছারের মতানৈক্য। অর্থাৎ সাহাবা রা. ও তাবেয়ী রহঃ গনের বাণী ও কর্মে যে মতানৈক্য বুঝা যায়।

তৃতীয়ঃ মাযহাবের মতানৈক্যঃ যা মুজতাহিদ ইমামগনের যুগে কোন মুজতাহিদের পছন্দনীয় মতামত তাঁর অনুসারীদের কাছে সর্বদার জন্য আমল যোগ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

এ জন্য উক্ত তিনটির প্রত্যেকটির ব্যাপারে পৃথক ভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। আর মূলতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতানৈক্য যেহেতু প্রথম প্রকার মতানৈক্যের শাখা বা প্রথম প্রকার মতানৈক্যের ফল সেহেতু বর্ণনার ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে লেখা পেশ করছি। আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই তাওফিক কামনা করছি।

প্রথম যুগ

বর্ণনার ভিন্নতার কারণসমূহ

প্রথম কারণ

সাহাবা কেরাম রা. এর কারণ না জানা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মাসআলা শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি বর্তমান যুগের মতো এমন ছিল না। বর্তমানে যেমন, ফেকাহের নামে সতন্ত্র কিতাব ও প্রবন্ধ, ছোট বড় লেখা, প্রত্যেকটি মাসআলা পৃথক পৃথক করে লেখা, প্রত্যেকটি মাসআলা ও আহকামের রুকন ও শর্ত, আদব ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছে। কিন্তু পূর্ব যুগে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মাসাইল শিখা ও শিখানোর পদ্ধতি ছিল এই যে, কোন হুকুম নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বাণী ও কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেখাতেন। যেমন ওযুর বিধান নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযু করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নামাজের বিধান নাযিল জিবরাইল আ. নিজে পড়িয়ে দেখিয়েছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে শিখিয়েছেন। তখন এ সমস্ত ইবাদত ও বিধানের বিশ্লেষণ করা হত না যে এটা ফরয, এটা ওয়াজিব ও এটা সুন্নাত। সাহাবাগণ রা. বিভিন্ন সম্ভাবনা ও যুক্তি সম্পর্কে প্রশ্নই করতেন না। যদি কেউ কোন বিষয়ে প্রশ্ন বা অভিযোগ করতো সেটা সবাই বিয়াদবী মনে করতো এবং তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি সমজিদে নামায আদায় করতে চায় তাহলে সে যেন বাঁধা না দেয়, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর এক পুত্র তাঁর যুগের (খারাপ) অবস্থা দেখে বলল আমি (বর্তমান যুগে) মসজিদে যেতে দিব না।[১]

---

১. البخاری : کتاب الاذان : باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس رقم الحدیث -٨٦٥ ،

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বিপরীতে পুত্রের উক্ত উক্তি শুনে শুধু ধমকিই দিলেন না বরং মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পুত্রের সাথে কথাও বলেন নি। আর পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বর্ণনা করলাম আর তুমি তার উত্তরে কথা বললে।[২]

এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা.এর কাছে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন যে, বেতের নামায ওয়াজিব না সুন্নাত? উত্তরে তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা আদায় করতেন, সাহাবাগন সর্বদা আদায় করতেন, এরপরও সে তিনবার জিজ্ঞাসা করল বেতের নামায ওয়াজিব না সুন্নাত? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. একই উত্তর দিতে লাগলেন।[৩] এর উদ্দেশ্য ছিল যে, আমল কারীর জন্য বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগনের আমল এই ছিল তখন এটা আমাল করা ওয়াজিব বুঝা যায়, মোটকথা মাসআলা শিক্ষা করা ও দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমলের মাধ্যমেই হত। সে সময় 'উযুতে অমুক কাজ ছুটে গেলে কি হুকুম? আর এমনটি করলে কি হুকুম?' এ ধরণের প্রশ্ন করাকে সবাই অপছন্দ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, হযরত ওমর রা. এমন ব্যক্তির ব্যাপারে লানত করেছেন যে ব্যক্তি এমন সকল বিষয়ে প্রশ্ন করে যা এখনো উপস্থিত হয় নি, তখন কোন সমস্যা বা মাসআলা সংঘঠিত হলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জিজ্ঞাসা করা হত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে মাসায়ালার

وابن ماجه ، كتاب السنة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الحديث -١٦، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه

১.বুখারী, হাদীস নং-৮৬৫, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৬

[২] . مسند احمد - ٣٦/٢ ، عن ابن عمر رضى الله عنه

২.মুসনাদে আহমাদ-২/৩৬

[৩] . مسند احمد - ٢٩/٢ ، عن ابن عمر رضى الله عنه

৩.মুসনাদে আহমাদ-২/২৯

মুনাসেব ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হুকুম বর্ণনা করে দিতেন এসকল ক্ষেত্রে মতানৈক্য হওয়া আবশ্যিক ও স্পষ্ট।

নিম্নের উদাহরণ স্বরুপ কয়েকটি ঘটনা দ্বারা এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম মুসলিম রহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করল যে, মসজিদে পৌঁছে দেওয়ার মত আমার কোন লোক নেই তাই আমার জন্য এই অনুমতি আছে কি যে, আমি মসজিদে না যেয়ে ঘরে নামায আদায় করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিলেন, এরপর এ কথা জানতে পেরে যে, তার ঘর মসজিদের এত নিকটে যে, আযান তার ঘরে পৌঁছে তখন তাকে অনুমতি দিলেন না এবং মসজিদে এসে নামাযে শরীক হতে বললেন।[৪] কিন্তু ইতবান ইবনে মালেক রা. এর ঘটনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অন্ধত্বের ওযর কবুল করে তাকে মসজিদে না আসার অনুমতি দিয়েছেন।[৫]

এমনিভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে দেখেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, বেলাল রা. আযান দিবেন আর তিনি তাকবীর বলবেন।[৬]

---

[৪] . مسلم : كتاب المساجد : باب فضل صلواة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها وانهافرض كفاية رقم الحديث- ١٤٨٦عن ابى هريرة رضى الله عنه.

৪.মুসলিম, হাদীস নং-১৪৮৬

[৫] . مسلم : كتاب المسا جد: باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر رقم الحديث -١٤٩٦ عن عتبان بن مالك رضى الله عنه

৫. মুসলিম, হাদীস নং-১৪৯৬

[৬] .ابوداود : كتاب الصلواة :باب الرجل يوذن ويقيم اخر، رقم الحديث-٥١٢، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقال المنذري: وذكرالبيهقى : ان فى اسناده ومتنه اختلافا وقال ابو بكر الحازمى: وفى اسناده مقال،

৬. আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১২,

কিন্তু এক সফরের ঘটনায় বনির্ত আছে যে, যিয়াদ ইবনে হারেস সাদায়ী রা. আযান দিলেন এর পর বেলাল রা. তাকবীর বলার ইচ্ছা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, যে ব্যক্তি আযান দিবে তাকবীর বলা তারই অধিকার এবং বেলাল রা. কে তাকবীর বলা থেকে বাঁধা দিলেন।[৭]

হযরত আবু বকর রা. একবার নিজের সমস্ত সম্পদ সদকা করলেন আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণও করলেন।[৮] কিন্তু অন্যান্য অনেক সাহাবী এমন ছিলেন যারা নিজের সমস্ত সম্পদ সদকা করেছেন অথবা সদকা করার ইচ্ছ করেছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কে বাধাঁ দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন।[৯]

মোটকথা এ ধরনের ঘটনা দু-একটি নয় বরং শত-সহস্র পর্যন্ত পৌছবে যেগুলো দ্বারা এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সাহাবীকে এমন কোন হুকুম ও নির্দেশ দিয়েছেন যা অন্যান্য সাহাবীদের দেননি। হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ

---

[৭] .ابوداود : كتاب الصلواة: باب من اذن فهو يقيم رقم الحديث-٥١٤،
وقال المنذرى: واخرجه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى: حديث زيادبن الحارث انما نعرفه من حد يث الافريقى والافريقى فهو ضعيف عند اهل الحد يث

৭.আবু দাউদ, হাদীস নং-৫১৪

[৮] .ابوداود: كتاب الزكاة : باب الرخصة فى ذلك رقم الحديث-١٦٧٨،
والترمذى : كتاب المناقب: باب رجاءة صلى الله عليه وسلم ان يكون ابوبكر ممن يدعى من جميع ابواب الجنة رقم الحديث-٣٦٧٥، وقال : هذا حديث حسن صحيح والدارمى، كتاب الزكاة : باب الرجل يتصدق بجميع ماله رقم الحديث-١٦٦٠، كلهم عن عمربن الخطاب رضى الله عنه

৮.আবু দাউদ, হাদীস নং-১৬৭৮, তিরমিযী, হাদীস নং-৩৬৭৫,দারেমী হাদীস নং-১৬৬০

[৯] .ابوداود : كتاب الايمان والنذور: باب من نذر ان يتصدق بماله رقم الحديث-٣٣١٩، عن كعب بن مالك رضى الله عنه وقال المنذرى: واخرجه النسائي ايضا مختصرا واخرجه البخارى و مسلم فى الحد يث الطويل.

৯.আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৩১৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে রোজা অবস্থায় তার স্ত্রীকে চুমু দেওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে নিষেধ করলেন। অনুমতি দিলেন না।[১০] একথা শুনলে হঠাৎ বুঝে আসল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে অনুমতি দিয়েছেন সে বৃদ্ধ আর যাকে অনুমিত দেন নি বা বারন করলেন সে যুবক ছিল।

সুতরাং উপরোক্ত ঘটনাগুলোতে প্রত্যেক সাহাবী এ বিষয়ই বর্ণনা করলেন যা তাঁর সামনে ঘটেছে ও যা তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনে নিয়েছেন। যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গন করা ও চুমু দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন সে অবশ্যই সকলের কাছে এ কথাই পৌঁছানোর চেষ্টা করবে যে, রোজা অবস্থায় চুমু দেওয়া ও আলিঙ্গন করা জায়েয ও রোজা ভঙ্গকারী নয়, পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি বেশ শক্ত ভাবেই তার বিপরীত বর্ণনা করবে এবং রোজা অবস্থায় এটাকে না-জায়েয বর্ণনা করবে, আর এটাই শেষ নয় যে, এই দুই ব্যক্তির ভিন্ন দু'টি বর্ণনা হয়ে গেছে বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে সব সময় ইলম অন্বেষনকারী ও আশেকীনদের জামাত, মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী, যিয়ারতকারী, দূত ও আমীরদের আনাগোনা হতে থাকতো।

এ কারণে উক্ত ভিন্ন দুটি হুকুম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রবনকারীরা যেখানে যাবেন তাঁরা সেখানে তিনি যা শুনেছেন তিনি সেটাই বর্ণনা করবেন যা তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিজ কানে শুনেছেন। বাস্তবে এটা এমন একটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার অধিনে যে পরিমানই বর্ণনার ভিন্নতা হোক তা অনেক কমই হয়েছে। কেননা মজলিসে মা'যুর গায়রে-মা'যুর, সুস্থ অসুস্থ, শক্তিশালী, দূর্বল সব ধরনের লোক আসতো আর প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি ও দূর্বলতার দিকে লক্ষ্য করে তার জন্য হুকুম পরিবর্তন হয়ে যেত। কোন কোন ব্যক্তির অন্তর এত শক্ত ছিল যে, যদি নিজের সমস্ত সম্পদ সদকা করে দেয় তাহলে তার যবানে

---

[১০] ابو داود : كتاب الصيام، باب كراهية القبلة للشاب، رقم الحديث-٢٣٨٧، عن ابي هريرة رضي الله عنه، وسكت عنه المنذري،

১০.আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৮৭

অভিযোগ অথবা প্রশ্ন তো দূরে কথা বরং তার অন্তরে এই প্রশান্তি লাভ হতো যে, তার যতই কষ্ট হবে ততই আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভ হবে ও আল্লাহর দিকে ধাবিত তত বেশী হতে থাকবে। এধরণের ব্যক্তির জন্য খুবই সমুচিত যে সে তার সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিবে। অন্য আরেক ব্যক্তি যার অন্তরে উক্ত প্রশান্তি নেই বরং সে সন্দেহের মাঝে ডুবে আছে। তার জন্য সমস্ত সম্পদ সদকা করা জায়েয নেই।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি খুব শক্তিশালী তার জন্য উচিত যে, সে সফর অবস্থায় রমযানের রোজা কাজা করবে না। যাতে করে রমযানের বিশাল ফযীলত থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি খুব দুর্বল সে যদি সফর অবস্থায় রোজা রাখে তাহলে তার ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। তার জন্য এ অবস্থায় রমযানের রোজা না রাখা জায়েয। উপরে উল্লেখিত এ সব পার্থক্যের কারণেই হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে ভিন্নতা ও পার্থক্য এসেছে।

হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন রমযানের ১৬ তারিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্বারোহি বাহিনী নিয়ে এক যুদ্ধে রওয়ানা হলেন, পথিমধ্যে আমাদের কিছু লোক রোজা রাখল আর অন্য দল ইফতার করল। এক্ষেত্রে পরস্পর কোন দলই অন্য দলকে তিরস্কার করলো না। না রোজাদারগন ইফতারকারীদেরকে তিরস্কার করল। না ইফতারকারীরা রোজাদারদের বিরোধিতা করল।[১১]

হযরত হামযা ইবনে আমর আমলামী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন আমার অভ্যাস হলো বেশি বেশি রোজা রাখা। আমি কি সফর অবস্থায় ও রোজা রাখব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন তোমার ইচ্ছা, মন চাইলে রাখতে পারো অথবা মন না চাইলে রেখো না।[১২] পক্ষান্তরে হযরত জাবের রা. বর্ণনা

[১১]. مسلم: كتاب الصيام، باب جوازالفطر والصوم في شهر رمضان للمسافر، رقم الحديث- ٢٦١٨،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

১১. মুসলিম, হাদীস নং-২৬১৮,

[১২]. بخاري: كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والافطار، رقم الحديث- ١٩٤٣،
وأبوداود، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، رقم الحديث- ٢٤٠٢،

করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সফর অবস্থায় রোজা রাখা কোন কল্যাণকর বিষয় নয়।[১৩] বরং অন্য হাদীসে আছে যে, যারা সফর অবস্থায় রোজা রেখে ছিলো তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোনাহগার বলে ছিলেন।[১৪] এর থেকে আরো শক্ত কথা বলেছেন, যে সফর অবস্থায় রোজা রাখা বাড়ীতে থাকা অবস্থায় রোজা ভেঙ্গে দেয়ার মতো।[১৫] (বাড়ীতে থাকা অবস্থায় যেমন রোজা না রাখা ঠিক নয় বরং গোনাহ তেমন সফরে থাকা অবস্থায় রোজা রাখা।)

والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر، رقم الحديث-٧١١، عن عائشة رضي الله عنها و قال: هذا حديث حسن صحيح.

১২. বুখারী, হাদীস নং-১৯৪৩, আবু দাউদ, হাদীস নং-২৪০২, তিরমিযি, হাদীস নং-৭১১।

১৩. مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم الحديث-٢٦١٢،

وأبو داود: باب اختيارالفطر، رقم الحديث-٣٤٠٧،

والنسائي: كتاب الصيام، باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، رقم الحديث- ٢٢٥٩، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

১৩. মুসলিম, হাদীস নং ২৬১২. আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৪০৭. নাসাঈ, হাদীস নং ২২৫৯।

১৪. مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الفطر و الصوم في شهر رمضان للمسافر، رقم الحديث-٢٦١٠، عن جابر رضي الله عنه.

والترمذي: كتاب الصوم، باب ماجاء في كراهية الصوم في السفر، رقم الحديث-٧١٠، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح.

والنسائي: كتاب الصوم، باب ذكر اسم الرجل، رقم الحديث-٢٢٦٥، عن جابر رضي الله عنه.

১৪. মুসলিম, হাদীস নং ২৬১০. তিরমিযী, হাদীস নং ৭১০. নাসাঈ, হাদীস নং ২২৬৫. ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৬৬৬।

১৫. نسائي: كتاب الصيام، باب ذكر قوله: الصائم في السفركالمفطر في الحضر، رقم الحديث-٢٢٨٦، عن عبد الرحمن بن عوف.

وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر، رقم الحديث-١٦٦٦، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

১৫. নাসায়ী, হাদীস নং-২২৮৬. ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৬৬৬.

মোটকথা বর্ণনার ভিন্নতার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো অবস্থার ভিন্নতা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন অবস্থা ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে দুই ব্যক্তিকে দুই সময়ে পৃথক পৃথক নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এক মজলিসে যে হুকুম দিয়েছেন অন্য মজলিসে সে হুকুমের ভিন্ন হুকুম দিয়েছেন। এটা তো স্পষ্ট বিষয়। এ জন্য এ দুইটি ভিন্ন হুকুম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুইটি বড় বড় দলে বিভক্ত হয়েছেন।

কোন কোন সাহাবী এরকম ছিলেন যে, তারা উভয় হুকুম শুনেছেন, তারা এ একই বিষয়ে দুইটি হুকুম শুনার পর তাঁদের এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা ফিকির এসেছে যে, উক্ত একই বিষয়ে দুইটি হুকুম দেয়ার কারণ কি? অতপর তাঁরা নিজ খেয়াল অনুযায়ী সেগুলোর মাঝে সমন্বয় করেছেন। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা রা. কর্তৃক রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া ও আলিঙ্গন করা প্রসঙ্গে দুইটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১৬] এ দুইটি হুকুমের মাঝে পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করে দিয়েছেন। এধরনের হাজারো ঘটনা রয়েছে এখানে সেগুলোর সংকুলান হবে না আর তা উদ্দেশ্য ও না। উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনা উদাহরণ স্বরুপ উল্লেখ করা হয়েছে এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এ বিষয়টি অস্পষ্ট কোন বিষয় নয়। তারপরও ঘটনাগুলো দ্বারা সহজে বুঝা যায় এবং বেশি মজবুত হয়। হাদীস বর্ণনার এ ভিন্নতা হওয়ায় সাহাবা, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের জন্য আবশ্যক হল, উভয় ধরনের বর্ণনার উৎস, অবস্থা ও ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করে প্রত্যেক বর্ণনাকে তার যথা স্থানে প্রয়োগ করা।

---

১৬. أبو داود: كتاب الصيام، باب كراهية القبلة للشاب، رقم الحديث- ٢٣٨٧، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسكت عنه المنذري.

১৬. আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৩৮৭

দ্বিতীয় কারণ

খাছ হুকুমকে ব্যাপক মনে করা

দ্বিতীয় কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য কোন হুকমকে খাসভাবে দিয়েছেন। কোন কারণে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন নির্দেশ দিয়েছেন, মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সে নির্দেশকে ব্যাপক নির্দেশ মনে করে ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর বর্ণনা হযরত আয়েশা রা. এর মতে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।[১৭] হযরত আয়েশা রা. এটা অস্বিকার করেন। কেননা, তাঁর ধারণা হলো বিশেষ এক মহিলার ব্যাপারে এ হুকুম দেয়া হয়েছিল। সে ইয়াহুদী মহিলা মৃত্যু বরণ করার পর তার পরিবারের লোক কান্না কাটি করতেছিল ও তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছি।[১৮]

---

[১৭] . بخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي صلي الله عليه و سلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، رقم الحديث-١٢٨٧،

مسلم: كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم الحديث- ٢١٣٣،

والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية البكاء علي الميت، رقم الحديث- ١٠٠٢،

والنسائي: كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء علي الميت، رقم الحديث- ١٨٢٩،

وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، رقم الحديث- ١٥٩٣، كلهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح.

১৭. বুখারী, হাদীস-১২৮৭, মুসলিম, হাদীস-২১৪৩, তিরমিযী,হাদীস-১০০২, নাসয়ী, হাদীস-১৮৪৯, ইবনে মাজাহ, হাদীস-১৫৯৩।

[১৮] . البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي صلي الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، رقم الحديث- ١٢٨٩،

مسلم: كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم الحديث- ٢١٢٣،

والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء علي الميت، رقم الحديث- ١٠٠٢،

والنسائي : كتاب الجنائز، باب النياحة علي الميت، رقم الحديث- ١٨٥٧،

এখানে আমাদের এধরণের অনেক বর্ণনা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয় এবং এব্যাপারে আলোচনা করাও উদ্দেশ্য নয় যে, জমহুরের মতে হযরত আয়েশা রা. এর মত গ্রহণযোগ্য নাকি হযরত ইবনে ওমর রা. এর মত গ্রহণযোগ্য? বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, এধরণের মতানৈক্য হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক রয়েছে।

এধরণের একটা বিষয় হল, হানাফীদের তাহকীক অনুযায়ী খুৎবার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদের হাদীস। তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালীক গাতফানী রা. নামের এক সাহাবী যিনি অত্যান্ত গরীব ও অসহায় ছিলেন তাঁকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার অনুমিত দিয়েছিলেন, যেন উপস্থিত লোকেরা তাঁর দারিদ্রতা দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিশেষ অবস্থা দেখে তাঁকে খুৎবার মাঝেই তাহিয়্যাতুল মসজিদ অর্থাৎ নফল নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।[১৯] কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা বন্ধ করে দাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু মজলিসে উপস্থিত অনেক সাহাবী যারা উক্ত হুকুমকে (অর্থাৎ খুৎবার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়াকে) সকলের জন্য জায়েয মনে করে সাধারণ ভাবে বলতেন,

---

وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، رقم الحديث-١٥٩٥، عن عائشة رضي الله عنها.

১৮. বুখারী, হাদীস নং-১২৮৯, মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৬, তিরমিযী, হাদীস নং ১০০৬, নাসায়ী, হাদীস নং-১৮৫৭, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫৯৫।

১৯ مسلم: كتاب الجمعة، باب التحية والامام يخطب، رقم الحديث-٢٠٢٣،

وأبو داود: كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والامام يخطب، رقم الحديث- ١١١٦،

وابن ماجة: أبواب اقامة الصلاة، باب فيمن دخل المسجد والامام يخطب، رقم الحديث- ١١١٢، كلهم عن جابر رضي الله عنه.

১৯. মুসলিম, হাদীস নং-২০২৩, আবু দাউদ, হাদীস নং-১১১৬. ইবনে মাজাহ,হাদীস নং-১১১২.

যে কেউ খুৎবার সময় মসজিদে উপস্থিত হবে তার জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকাআত নামায পড়া উচিত।[২০]

এ ধরণের আরো একটি হল, হযরত হুযাইফা রা. এর গোলাম সালেম রা. এর দুধ পানের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র তাঁকেই সেই হুকুম দিয়েছিলেন।[২১] কিন্তু হযরত আয়েশা রা. উক্ত হুকুমকে ব্যাপক মনে করে ব্যাপক আকারে হুকুম লাগিয়েছেন।[২২] আর অন্য উম্মাহাতুল মুমিন রা. সর্বাস্থায় এটাকে অস্বিকার করেছেন। হযরত উম্মে সালমা রা. বর্ণনা করেন এর কারণ আমার জানা নেই। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, এ হুকুম শুধু সালেম (রা) এর সাথেই খাস ছিল। (অন্যদের জন্য নয়)[২৩] হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর কথার কারণ এটাই যা ইবনে কুতাইবা রহ. "তাওবীলে মুখতালাফিল হাদীস" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তা এই যে,

أن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: والله إن كنت لأرى أنى لوشئت لحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتا بعين، ولكن بطانى عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت

[২০] . الترمذي: كتاب الجمعة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم الحديث- ٥١١، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح.

২০. তিরমিযি, হাদীস নং ৫১১,

[২১] . مسلم: كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، رقم الحديث- ٣٦٠٠،
وأبو داود: كتاب النكاح، باب من حرم به، رقم الحديث- ٢٠٦١،
والنسائي: كتاب النكاح، باب رضاع الكبير، رقم الحديث- ٣٣٢٢، كلهم عن عائشة رضي الله عنها.

২১. মুসলিম, হাদীস নং ৩৬০০, আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৬১, নাসাঈ, হাদীস নং ৩৩২২,

[২২] . البخاري: كتاب النكاح، باب من قال: 'لا رضاع بعد حولين' رقم الحديث- ٥١٠٢،
ومسلم: كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، رقم الحديث- ٣٦٠٦، عن عائشة رضي الله عنها.

২২. বুখারী, হাদীস নং ৫১০২, মুসলিম, হাদীস নং ৩৬০৬,

[২৩] . مسلم: كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، رقم الحديث- ٣٦٠٥، عن أم سلمة رضي الله عنها.

২৩. মুসলিম কিতাবুর রযা হাদীস নং ৩৬০৫,

ويحدثون احاديث ماهى كما يقولون، وأخاف ان يشبه لى كما شبه بهم فاعلمك انهم كانوايغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون.[٢٤]

সাহাবী হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম আমার এ পরিমাণ হাদীস মুখস্ত আছে যে যদি আমি চাই তাহলে ধারাবাহিক দুই দিন পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করতে পারি। কিন্তু বাধা হল, আমার ন্যায় অন্যান্য সাহাবীও হাদীস শুনেছেন ও আমার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে তারাও উপস্থিত ছিলেন। তারপরও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার ভয় হয় যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার সংশয় হয়ে যাবে যেমন সংশয় তাদের হয়েছে। তবে আমি এ ব্যাপারে সর্তক করছি যে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের যা কিছু হয়েছে তা ধারণা প্রসুত হয়েছে তাঁরা বুঝেশুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল বর্ণনা করেন নি।

এজন্যই হযরত ওমর রা. তাঁর খেলাফত কালে অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন। এমনকি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এই আধিক্যতার কারণে তিনি কোন কোন সম্মানিত সাহাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন।[২৫]

হযরত আবু সালমা রা. হযরত আবূ হুরায়রা রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি হযরত ওমর রা. এর যুগেও এতো বেশী হাদীস বর্ণনা করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, তখন এতো বেশী হাদীস বর্ণনা করলে হযরত ওমর রা. দোররা মেরে খবর করে দিতেন।[২৬]

মোটকথা বর্ণনার ভিন্নতার দ্বিতীয় কারণ এটাও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিশেষ ব্যক্তিকে কোন বিশেষ হুকুম দিয়েছে, আর সে হুকুমকে বর্ণনাকারী ব্যাপক মনে করে ব্যাপক আকারে বর্ণনা করে দিয়েছেন। যার কিছু উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হল।

---

[২৪]. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، رقم الصفحة- ٣٠،

২৪. তাওবীলু মুখতালাফিল হাদীস (ইবনে কুতাইবা) পৃষ্টা নং ৩০।

[২৫]. তাযকিরাতুল হুফফায (আল্লামা যাহাবী রহ) - ১/৭

[২৬]. তাযকিরাতুল হুফফায-১/৭

তৃতীয় কারণ

কোন ব্যাপক হুকুমকে খাস হুকুম মনে করা

তৃতীয় কারণ হলো দ্বিতীয় কারণের বিপরীত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন হুকুম ব্যাপক আকারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সেটাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে অথবা কোন বিশেষ সময়ের সাথে খাস মনে করেছেন। এর উদাহরণ ও পূর্বোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরুপ মৃতকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর বর্ণনা যা হযরত আয়েশা রা. এর মতে ইয়াহুদী মহিলার সাথে খাস ছিল। আর এ সকল স্থান যাচাই বাছাই করার জন্য মুজতাহিদ ইমামগণের প্রয়োজন। যাদের সামনে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা উপস্থিত রয়েছে। সাহাবাগণের বিভিন্ন বানী উপস্থিত থাকলে যেগুলোর মাঝে সমন্বয় থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কোন হুকুমটি ব্যাপক আর কোনটি খাস এবং এর কারণ কি? তদ্রুপ এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে কেন কোন বিষয় কোন এক ব্যক্তির জন্য জায়েয সাব্যস্ত করা হয়েছে আবার ঐ বিষয়টি অন্য ব্যক্তির জন্য না-জায়েয সাব্যস্ত করা হয়েছে?

চর্তুথ কারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি কাজ থেকে বিভিন্ন বিষয় ইসতিম্বাত (উদঘাটন) করা

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মতানৈক্য অনেক সময় এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক ব্যক্তিকে কোন একটি কাজ করতে দেখেছেন আর বিভিন্ন মানুষের বুঝ শক্তি বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে এটাতো স্পষ্ট। যেমন কেউ কেউ মুজতাহিদ ফকীহ ও বিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাই বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গিতে বুঝেছেন। তিনি ঘটনা যতার্থ বুঝেছেন। আবার কেউ প্রখর মেধার অধিকারী। তাই ঘটনা স্বরণ রাখার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ব্যক্তি থেকেও অধিক যোগ্য। কিন্তু মাসয়ালা বুঝার দিক থেকে প্রথম ব্যক্তির চেয়ে নিম্ন স্তরের। এ ধরণের ব্যক্তিরা নিজ বুঝশক্তি অনুযায়ী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর উদাহরণ হজ্জের অধ্যায়ে অনেক রয়েছে।

উদাহরণঃ এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ' لبيك بحجته ' বলতে শুনেছেন।[২৭] এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই বর্ণনা সহীহ। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করেন নি। কিন্তু অন্যান্য সাহাবাগণ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিরান হজ্জের ইহরাম বেধে ছিলেন।[২৮] এই বর্ণনা টি বাহ্যত প্রথমোক্ত বর্ণনার বিপরীত বুঝা যায়। কেননা কেরান হজ্জ হল এফরাদ হজ্জের বিপরীত। কিন্তু বাস্ত বতা হল, উভয় বর্ণনার মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা কেরানকারীর জন্য " لبيك بحجته" বলাও জায়েয আছে। এখন শুধু মুজতাহিদের কাজ উভয় ধরণের বর্ণনা সামনে রেখে তাতে সমন্বয় করা ও উভয়টির প্রয়োগ স্থল পৃথক সাব্যস্ত করা। যাতে বিভিন্ন বর্ণনার পার্থক্যের কারণে সংশয় সৃষ্টি না হয়। এ ধরণের আরেকটা বিষয় হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম বাঁধার আমল কোথা থেকে শুরু করেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহরামের কাজ শুরু করার বর্ণনার ভিন্নতার কারণেই ইমামগণের মাঝেও মতানৈক্য হয়ে গেছে যে, ইহরাম বাঁধা কখন উত্তম?

এই বর্ণনার ভিন্নতার কারণেই প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. হিবরুল উম্মাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে এই বর্ণনার ভিন্নতা উল্লেখ করে সমাধান জানতে চেয়েছেন। আবু দাউদ শরীফে এর বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মোটামোটি অর্থ হল,

---

[২৭] . السنن الكبري للنسائي: كتاب الحج، باب من اختار القران، و زعم أن النبي صلي الله عليه و سلم كان قارنا، رقم الحديث- ٨٨٣٠.

২৭. নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৩০

[২৮] . البخاري: كتاب الحج، باب التمتع و القران والأفراد بالحج، رقم الحديث- ١٥٦٣،

مسلم: كتاب الحج، باب في الإفراد و القران، رقم الحديث- ٢٩٩٥، عن علي رضي الله عنه.

২৮. বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৩, মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৫

হযরত আবু সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. বর্ণনা করেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে. সাহাবাদের এই মতানৈক্য আমার কাছে অবাক লাগে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহরাম বাঁধার কাজ শুরু কখন হয়েছিল আমার বুঝে আসে না এতো মতানৈক্য কেন হল?' উত্তরে তিনি বললেন এর মূল বিষয় আমার ভালোভাবে জানা আছে, বাস্তবতা হল এই যে, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একবার হজ্জ করেছেন (তাও আবার জীবনের শেষ প্রান্তে। এজন্য অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছিল, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে অবস্থায় যে কাজ করতে দেখেছেন সেটাকেই তিনি আসল মনে করেছেন) এ জন্য মতানৈক্য হয়ে গেছে। সে হজ্জের ঘটনা ছিল নিম্নরুপ,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের সফরে যখন যুলহুলাইফা নামক স্থানে অবস্থান করেন সেখানকার মসজিদে ইহরাম বাঁধলেন তখনই ইহরাম বেঁধেছিলেন যে সময় যে পরিমাণে লোক উপস্থিত ছিল তাঁরা তা শুনলেন এবং পরবর্তীতে তারা এটাই বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম শেষ করে উটে আরোহন করলেন। উট যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে দাঁড়াল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জোরে 'লাব্বাইক' বললেন। যারা আগেও উপস্থিত ছিলেন তারাতো বুঝলেন যে এ 'লাইব্বক' দ্বিতীয়বার। কিন্তু সে সময় যারা নিকটে ছিলেন এবং প্রথমে নিকটে ছিলেন না এবং প্রথম 'লাইব্বাক' শুনেন নাই তাঁরা এটা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটে আরোহন করার পর ইহরাম বাঁধার কাজ শুরু করেছেন। উপস্থিত লোক সংখ্যা বেশী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজ সকলের কাছে পৌঁছে নাই। আর প্রত্যেক সাহাবী অনেক বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতে পারেন নাই। বরং খন্ড খন্ড দলে বিভক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হতেন এবং মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উট সেখান থেকে বায়দার নামক স্থানের

উঁচু জায়গায় আরোহন করলেন। আর (হাজ্জীদের জন্য যেহেতু উঁচু স্থানে 'লাব্বাইক' বলা মুস্তাহাব তাই) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উঁচু আওয়াজে 'লাব্বাইক' বলেছেন। আর সে সময় যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলেন তাঁরা এটা শুনলেন এবং এটাই বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়দার নামক স্থানে ইহরাম বেঁধেছেন অথচ আল্লাহর কছম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের জায়গায় ইহরাম বেঁধেছিলেন আর অন্য সকল স্থানেই ' লাব্বাইক' বলেছেন।[২৯] আর যেহেতু হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. বিভিন্ন বর্ণনা শুনেছিলেন সেহেতু তাঁর তাহকীক করার প্রয়োজন হয়েছিল। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এ সব ঘটনা জানতেন এ জন্য অত্যান্ত আস্থার সাথে ইহরাম বাঁধার শুরু কোথায় হয়েছিল তা বলে দিয়েছেন এবং তিনি নিজে ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন তাই বর্ণনার ভিন্নতা হওয়ায় সেগুলোর মাঝে সমন্বয়ও করে দিয়েছেন। কিন্তু কোন সাধারন মানুষ এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার শুধু শব্দের অনুবাদ জানলে সে বেচারা খুব পেরেশান হয়ে যাবে এবং ধারণাপ্রসূত বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিযোগ করে ফেলবে। এজন্যই 'গায়রে মুকাল্লেদরা'ও নিজেদের বাড়াবাড়ি ও গোড়ামি সত্ত্বেও 'তাকলীদ' (অনুস্বরন) থেকে মুক্ত নয়। হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ নিজ কিতাব 'ছাবীলুর রশাদ' নামক কিতাবে গায়রে মুকাল্লেদদের নেতা মৌলভি মুহাম্মাদ হুসাইন বাটলবী এর কথা 'ইশাআতুস সুন্নাহ' নামক কিতাব থেকে উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ ১১ তম খন্ডের ২১১ পৃষ্টায় লেখেন 'গায়রে মুজাতাহিদ মুতলকের জন্য মুজতাহিদ থেকে পলায়ন করার কোন সুযোগ নেই' (যারা কোন মাযহাবের অনুসারী নয় তারা কোন কোন মাযহাব বা মতের অনুসরণ করা থেকে বাচতে পারবে না)। দ্বিতীয়ত ১১তম খন্ডের ৫৩ পৃষ্টার লেখেন ২৫ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি একথা

[২৯] أبو داود: كتاب المناسك، باب وقت الإحرام، رقم الحديث- ١٧٧٠، عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وقال المنذري في تلخيصه: في أسناده خصيف بن عبد الحراني وهو ضعيف. وفي إسنادة أيضا محمد بن أسحاق.

২৯. আবু দাউদ, হাদীস নং ১৭৭০

বুঝতে পেরেছি যে, ইলমহীন লোকেরা মুজতাহিদে মুতলাক ও মুতলাক তাকলীদ বর্জনকারী হয়ে যায় (যে ইলমহীন লোকেরা কোনো মাযহাবের অনুসরণ না করে তারা শেষ পর্যায়ে) পরিশেষে ইসলামকে বিদায় জানায়। তাদের মধ্যে কিছু লোক হয় খ্রীষ্টান। আর কিছু হয় লা-মাযহাব যাদের দ্বীন ও মাযহাবের কোন পরওয়া থাকে না। আর এটাই হল, শরীয়তের বিধিবিধানের গণ্ডি থেকে বের হওয়া এবং বিধিবিধান অমান্য করার সামান্য কুফল।'

পঞ্চম কারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন আমলকে অভ্যাস বা সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করা

এই কারণ ও পূর্বোক্ত কারণের কাছাকাছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন কাজ কর্ম দেখে কিছু লোক ঐ কাজকে স্বভাব প্রসূত ও সাধারণ অভ্যাস মনে করেছেন। আবার কেউ এ কাজ কর্ম দেখে এটাকে ইচ্ছাকৃত ইবাদত মনে করেছেন। তাঁরা এটাকে সুন্নত ও মুস্ত াহাব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর অনেক উদাহরণ হাদীসের কিতাবে রয়েছে। তবে নমুনা হিসেবে বিদায় হজ্জে 'আবতহ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান করাকে দেখা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অবস্থানকে কেউ অস্বিকার করেনি।[৩০] হযরত আবু হুরায়রা রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর মতে এটাও হজ্জের আমল সমূহের একটি আমল। তাই হাজ্জীদের জন্য সেখানে অবস্থান করা সুন্নত।[৩১] পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা ও আব্দুল্লাহ

---

[৩০] . البخاري: كتاب الحج، باب أين يصلي الظهر يوم التروية، رقم الحديث- ١٦٥٣، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

مسلم: كتاب الحج، باب استحباب نزول المحصب يوم النضر، رقم الحديث-٣١٦٦، عنه به.

৩০. বুখারী, হাদীস নং ১৬৫৩, মুসলিম,হাদীস নং-৩১৬৬

[৩১] . البخاري: كتاب الحج، باب النزول بذي طوي قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة، رقم الحديث-١٧٦٨، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ইবনে আব্বাস রা. এর মতে উক্ত যায়গায় অবস্থান ঘটনাক্রমে হয়েছিল (ইবাদত হিসেবে নয়) তাই এর সাথে হজ্জের মাসয়ালার কোন সম্পর্ক নেই। খাদেমরা সেখানে তাঁবু গেঁড়েছিল এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে অবস্থান করেছিলেন। তাছাড়া সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়াও সহজ ছিল। কেননা কাফেলা এদিক থেকে সেদিক ছত্র ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৩২]

এক্ষেত্রে ফকীহ ও মুজতাহিদের প্রয়োজনীয়তাকে কেউ অস্বিকার করতে পারবে না। যার কাজ হবে উক্ত অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন সাহাবী রা. থেকে বিভিন্ন বর্ণনা ও মতামত গুলোকে একত্রিত করে সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়া। আর ইমামগণ এ কাজই করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণী

منز لنا غدا انشاء الله بخيف بنى كنا نة حيث تقاسمواعلى الكفر

অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল খাইফে বনী কিনানাতে অবস্থান করবো। যেখানে নবুওয়াতের প্রথম দিকে মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল।[৩৩]

مسلم: كتاب الحج، باب استحباب نزول المحصب يوم النضر، رقم الحديث-٣١٦٨، عنه به.

৩১. বুখারী, হাদীস নং ১৭৬৮, মুসলিম,হাদীস নং-৩১৬৮

[৩২]. البخاري: كتاب الحج، باب المحصب، رقم الحديث- ١٧٦٥، عن عائشة رضي الله عنها، وحديث رقم-١٧٦٦ ،عن ابن عباس رضي الله عنه.

مسلم: في كتاب الحج، باب استحباب نزول المحصب يوم النضر، رقم الحديث- ٣١٦٩، عن عائشة رضي الله عنها، و حديث رقم - ٣١٧٢، عن أبن عباس رضي الله عنه.

وأبو داود: كتاب المناسك، باب التحصيب، رقم الحديث- ٢٠٠٨، عن عائشة رضي الله عنها، وحديث رقم- ٩٢٢، عن أبن عباس رضي الله عنه، وقال: هذا حديث صحيح.

৩২. বুখারী, হাদীস নং-১৭৬৫,১৭৬৬, মুসলিম,হাদীস নং-৩১৬৯, ৩১৭২ আবু দাউদ, হাদীস নং-২০০৮,৯২২.

[৩৩]. مسلم: كتاب الحج، باب استحباب نزول المحصب، رقم الحديث- ٣١٧٤، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

৩৩.মুসলিম, হাদীস নং-৩১৭৪

এ বাণী থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেখানে অবস্থান করা ঘটনাক্রমে হয়নি বরং কাফেরদের কুফরী নিদর্শন প্রকাশ করার স্থানে ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সেখানে অবস্থান করেছেন। এর সাথে যদি অন্যান্য আরো কোন উপকারিতা পাওয়া যায় যেমন, মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তা যেহেতু সেদিকে। এজন্য ফিরে আসতে সহজ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো এ কথা প্রমাণ করেনা যে, সেখানের অবস্থান ইচ্ছাকৃত ছিল না। (বরং প্রমাণ করে যে সেখানের অবস্থান ইচ্ছাকৃত ছিল।)

ষষ্ঠ কারণ

হুকুমের ইল্লত (কারণ) এর ব্যাপারে মতানৈক্য

অনেক সময় হাদীসের বর্ণনার ভিন্নতা সৃষ্টির কারণ হয় হুকুমের ইল্লতের ভিন্নতা। উদাহরণ স্বরূপঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন এমন অবস্থায় এক কাফেরের লাশ তাঁর কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে গেলেন। কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সকল ফেরেশতাদের সম্মানে দাড়িয়েছিলেন যারা লাশের সাথে এসেছিলেন।[৩৪] সুতরাং যদি মু'মিনের লাশ নেওয়া হয় তাহলে তো দাড়ানো সাভাবিকভাবেই উত্তম হবে। তাই যাদের মতে দাড়ানোর মূল কারণ এটাই (অর্থাৎ লাশের সাথে ফেরেস্তাদের সম্মানে দাড়ানো উচিত) তাঁরা এ হাদীস বর্ণনার সময় কাফের শব্দ উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন না। কেননা তাঁদের মতে কাফের বা মুসলমান হওয়া কোন পার্থক্য নেই। (লাশ মাত্রই তার সাথে ফেরেস্তা থাকেন)

পক্ষান্তরে অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জন্য দাড়িয়েছিলেন যেন মুসলমানদের মাথার

---

[৩৪] . النسائي: كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، رقم الحديث-١٩٣١، عن أنس رضي الله عنه.

৩৪. নাসাঈ, হাদীস নং- ১৯৩১

উপর দিয়ে কোন কাফেরের লাশ না যায়। কেননা এতে মুসলমানের অসম্মান হবে।[৩৫] এ অবস্থায় দাড়ানো শুধু কাফেরের লাশের সাথে খাস। তাই এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কাফের শব্দ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

এমনিভাবে হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রা. বর্ণনা করেন বর্গা চাষের ভিত্তিতে জমি দেওয়া আমাদের জন্য লাভ ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের অনুস্বরন সকল লাভের উর্ধ্বে।[৩৬] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. বর্ণনা করেন আমরা বর্গা চাষের ভিত্তিতে জমির কারবার করতাম আর আমরা এটাকে কোন দোষ মতে করতাম না। কিন্তু যখন হযরত রাফে ইবনে খদীজ রা. বললেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা করতে নিষেধ করেছেন তখন আমরা তা বাদ দিলাম।[৩৭]

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রা. থেকেই অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন আমার চাচা সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা এভাবে জমিবর্গা দিতেন যে, নালার পার্শ্ববর্তী জমির থেকে উৎপন্ন ফসল জমির মালিকের জন্য। আর অবশিষ্টাংশের জমির ফসল কৃষকের। অথবা জমির অন্য কোন বিশেষ অংশ নিদৃষ্ট করেনিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন। কেউ রাফে ইবনে খাদীজ রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন যদি টাকার

---

[৩৫] . النسائي: كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، رقم الحديث-١٩٢٨، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما.

৩৫. নাসায়ী, হাদীস নং-১৯২৮.

[৩৬] . مسلم: كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، رقم الحديث- ٣٩٤٥، عن رافع بن خديج رضي الله عنه.

أبو داود: كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك، رقم الحديث- ٣٣٩٥، عنه رضي الله عنه.

৩৬. মুসলিম, হাদীস নং-৩৯৪৫, আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৩৯৫

[৩৭] . مسلم: كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، رقم الحديث- ٣٩٣٥، عن ابن عمر رضي الله عنه.

৩৭. মুসলিম, হাদীস নং-৩৯৩৫.

বিনিময়ে হয় তাহলে? তিনি উত্তরে বললেন টাকার বিনিময় হলে কোন ক্ষতি নেই।[৩৮]

পক্ষান্তরে উপরোক্ত বর্ণনা সমুহের বিপরীতে হযরত আমর ইবনে দীনার রাহ. বলেন আমি হযরত ত্বউস রাহ. কে বললাম যে, আপনি বর্গা চাষের ভিত্তিতে জমি দেওয়া বর্জন করুন। কেননা সাহাবাগন এ লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন সাহাবাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্গা চাষ করতে নিষেধ করেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, জমি কোন মুসলিম ভাইকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া চাষাবাদের জন্য দেওয়া ভাড়া দেওয়ার চেয়ে উত্তম।[৩৯] এ দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর মতানুযায়ী উক্ত নিষেধের কারণ ছিল একজন মুসলমানের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। মাসয়ালার দিক থেকে না-জায়েয হওয়ার কারণে নয়। কিন্তু হযরত রাফে এর মতানুযায়ী নিষেধের কারণ ছিল না-জায়েয হওয়া। এ ধরণের উদাহরণ হাদীসের কিতাবে অনেক রয়েছে।

মোটকথা হল, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন হুকুমকে বর্ণনাকারী কোন কারণের উপর প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ হাদীসের বর্ণিত হুকুম কোন কারণে হয়েছে। আবার অন্য বর্ণনাকারী ঐ হুকুমকেই অন্য কারণের উপর প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী হুকুমের

---

[৩৮] . البخاري: كتاب الحرث والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب و الفضة، رقم الحديث- ٢٣٤٦، عن رافع بن خديج رضي الله عنه.

৩৮. বুখারী, হাদীস নং-২৩৪৬.

[৩৯] . البخاري: كتاب المزارعة، باب بلا ترجمة، رقم الحديث-٢٣٣٠،
ومسلم: كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، رقم الحديث- ٣٩٥٧.
و أبو داود: كتاب البيوع، باب المزارعة، رقم الحديث- ٣٣٨٩.
والنسائي: كتاب المزارعة، باب ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث و الربع رقم الحديث- ٣٩٠٤، كلهم عن ابن عباس رضي الله عنه.

৩৯.বুখারী, হাদীস নং-২৩৩০, মুসলিম, হাদীস নং-৩৯৫৭, আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৩৮৯, নাসায়ী, হাদীস নং-৩৯০৪.

কারণ বর্ণনা করেছেন যেমন তারা বুঝেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তির সামনে উভয় ধরনের বর্ণনা, মূলনীতি উপস্থিত সে অবশ্যই একটিকে প্রাধান্য দিবেন। কোন একটিকে মূল এবং অন্যটির ব্যাখ্যা ও গবেষণার যোগ্য সাব্যস্ত করবেন। তবে এ কাজ কে আন্‌জাম দিবেন? এ ধরনের কাজ কেবল সে ব্যক্তিই করতে পারবেন যার সামনে সকল বিষয়ের অসংখ্য হাদীস, প্রত্যেক হাদীসের বিভিন্ন শব্দ উপস্থিত রয়েছে। সে ব্যক্তি নয় যার সামনে শুধু একটি মাত্র হাদীস রয়েছে। সে ব্যক্তির তো এ হাদীসটি অন্য হাদীসের সাথে বাহ্যিক বিরোধ হওয়ার কথা জানে না। একটি হাদীসকে আরেকটি হাদীসের উপর প্রধান্য দেওয়ার বিভিন্ন কারণও তার জানা নেই। সে ব্যক্তি কি করে কোন একটি কারণকে প্রাধান্য দিতে পারবে এবং কোন একটি হাদীসকে অন্য হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতে পারবে?

সপ্তম কারণ

হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে মতানৈক্য হওয়া

হাদীসের বর্ণনার ভিন্নতার অন্যতম একটি বড় কারণ হল, অনেক শব্দ এমন রয়েছে যা আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে সমানভাবে ব্যবহারিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে কোন কথা বলেছেন কিন্তু কতক শ্রবনকারী এটাকে ভিন্ন অর্থ মনে করে ব্যবহার করেছেন। এর উদাহরণ দুই-একটি নয় বরং হাজার হাজার। উদাহরণ স্বরূপ 'ওযু' শব্দটি। পারিভাষিক অর্থে পরিচিত ওযুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। শামায়েলে তিরমিযির এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত সালমান ফারসী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরয করলেন যে, আমি তাওরাতে পড়েছি যে, খাওয়ার পরে ওযু করা খাবারে বরকত হওয়ার মাধ্যম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন খাওয়ার আগে ও পরে ওযু করা খাবারে বরকত হওয়ার মাধ্যম।[৪০] হযরত সালমান রা. এর উক্ত বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[৪০] شمائل الترمذي، باب ما جاء في صفة رسول الله صلي الله عليه وسلم عند الطعام، رقم الحديث-١٨٦، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.

৪০. শামায়েলে তিরমিযী, হাদীস নং-১৮৬

আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে যে ওযু শব্দটি ব্যবহারিত হয়েছে সবার কাছে স্পষ্ট যে এ ওযু দ্বারা উদ্দেশ্যে হাত ধৌত। (পারিভাষিক ওযু উদ্দেশ্য নয়)

এমনিভাবে তিরমিযি শরিফে ইকরাশ রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার শেষের দিকের অর্থ খানার শেষে পানি আনা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দ্বারা নিজ হাত মুবারক ধুলেন এবং মুখমন্ডল ও বাহুদ্বয়ের উপর মাছেহ করলেন আর বললেন, ইকরাশ আগুন দ্বারা পাকানো বস্তুর ব্যাপারে যে ওযু করার হুকম এসেছে তা হলো এই ওযু।[৪১] বর্ণনাটি যদিও সমালোচিত কিন্তু এ বিষয় নিশ্চিত যে, উক্ত হাদীসে ওযু শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি।

এমনিভাবে 'জামউল ফাওয়ায়েদ' নামক কিতাবে হযরত বায্যার রহ. বর্ণনা করেন, হযরত মুয়ায রা. এর কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করল আপনি আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে কি ওযু করেন? তিনি বললেন হাত মুখমন্ডল ধোয়া এবং এটাকেই ওযু হিসেবে ব্যক্ত করা হয়।[৪২] এই বর্ণনার কারণে-ই চার ইমামের সর্ব সম্মতি সিদ্ধান্ত হলো, যে সকল হাদীসে আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর ওযুর কথা বলা হয়েছে সে সকল হাদীসে ওযু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আভিধানিক অর্থ। অথবা (যদি পারিভাষিক ওযু উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা) হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

এমন একটি বর্ণনা আছে যে, একবার হযরত আলী রা. ওযুর করেয়কটি অঙ্গ ধুয়ে বললেন هذا وضوء من لم يحدث 'ইহা ঐ ব্যক্তির ওযু যে পূর্ব থেকেই ওযু অবস্থায় আছে'।[৪৩] একথা তো নিশ্চিত যে কয়েকটি অঙ্গ

---

[৪১]. الترمذي، كتاب الاطعمة، باب ما جاء في التسمية في الطعام، رقم الحديث- ١٨٣٤، عن عكراش رضي الله عنه، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء.

৪১. তিরমিযী, হাদীস নং-১৮৩৪

[৪২]. جمع الفوائد، كتاب الطهارة، باب نواقض الطهارة، رقم الحديث- ٦٧٧، عن معاذ رضي الله عنه.

৪২. জামউল ফাওয়ায়েদ, হাদীস নং-২৭৭

[৪৩]. النسائي، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من غير حدث، رقم الحديث- ١٣٠، عن علي رضي الله عنه.

৪৩. নাসাঈ, হাদীস নং ১৩০

ধোয়াকে শরয়ী ওযু বলে না। উক্ত উদাহরণগুলো হলো সে সকল স্থানের জন্য যেখানে নিশ্চিতভাবে শরয়ী ওযু উদ্দেশ্য নয়। এগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওযু শব্দ ও অন্যান্য এমন শব্দ রয়েছে যেগুলো আভিধানিক, পারিভাষিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণ স্পষ্ট হল যে, অনেক সময় এমন অবস্থা হয় যে, কোন কোন বর্ননাকারী ওযু দ্বারা পারিভাষিক ওযু প্রয়োগ করেন তাই তিনি كوضوئه للصلوة শব্দ বৃদ্ধি করে দেন যাতে কোন সন্দেহ না থাকে ও শ্রবনকারীর কোন অস্পষ্টতা না থাকে। পক্ষান্তরে যে বর্ণনাকারীর তাহ্কীক অনুযায়ী ওযু দ্বারা এখানে পারিভাষিক ওযু নয় বরং আভিধানিক ওযুই উদ্দেশ্য, তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে হাত, মুখ ধোয়া শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন। যাতে শ্রবনকারীর কোন সন্দেহ না থাকে এবং সাথে সাথে হাদীসের অর্থও জানা হয়ে যায়। এভাবে এ ধরণের ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার ভিন্নতা সৃষ্টি হয় যার ফলে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাঁদের পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগনের মাঝেও মতানৈক্য হয়ে যায়। এ জন্যই প্রথম যুগে আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর ওযু ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে ইমামগণের যুগে যেহেতু ওযু ভঙ্গের কারণ অধিক ছিল তাই ওয়াজিব না হও‍য়াকে প্রাধন্য দেওয়া হয়েছে। চার ইমাম ওযু ভঙ্গ না হওয়ার উপর একমত হয়েছেন। তদুপরি এমন অসংখ্য মাসআলা রয়েছে যেগুলোতে উক্ত মতানৈক্য বাকী রয়েগেছে। উদাহরণ স্বরূপ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওযু করার হুকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন من مس ذ كره فليتوضأ যে ব্যক্তি স্বীয় লজ্জস্থান স্পর্শ করবে সে যেন ওযু করে নেয়।[88] সাহাবা ও তাবেয়ীগনের

[88]. أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث- ١٨١،
والترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث- ٨٢،
والنسائي- كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث-١٦٣،
وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء، من مس الذكر، رقم الحديث-٤٧٩، كلهم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

মাঝে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, উক্ত ওযু দ্বারা কোন ওযু উদ্দেশ্য কারো কারো মতে পারিভাষিক ওযু উদ্দেশ্য আবার কারো কারো মতে আভিধানিক ওযু উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে অন্য আরেকটি মতানৈক্য হলো কারো কারো মতে 'স্পর্শ করার' শব্দটি হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্বাভাবিক হাত লাগানো উদ্দেশ্য। অন্য কারো কারো মতে এখানে 'স্পর্শ করা' শব্দটির অর্থ হলো পেশাব করা আর তা এজন্য যে, পেশাবের পর ইস্তেঞ্জা শিখানোর জন্য হাত দ্বারা স্পর্শ করা হয়। এমনিভাবে ওযুর হুকুমেও মতানৈক্য ছিল আর তা হয়েছেও তাই কেউ কেউ এ ওযুকে ওয়াজিব মনে করে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ ওযুকে উত্তম ও মুস্তাহাব মনে করে ওযু করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। যা আমরা অষ্টম কারণে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। এ প্রকার হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ বাণী যে নামাযীর সামনে দিয়ে মহিলা, কুকুর ও গাধা যাওয়ার কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।[৪৫] কতক শ্রবনকারী এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করে নামায ভঙ্গ হওয়া দ্বারা বাস্তবেই নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে বলেছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন সাহাবী ও ফকীহদের মতে নামায ফাসেদ হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে তাঁদের নিকট এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং তাঁদের মতে 'নামায ফাসেদ/ভঙ্গ' হয়ে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাযের একগ্রতা ও খুশু নষ্ট হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য আর এর পক্ষে দুই একটি নয় বরং অসংখ্য আলামত বিদ্যমান রয়েছে। যা নিজ নিজ স্থানে বর্ণিত হয়েছে। আর এখানে সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্য আমরা তা বর্জন করলাম।

---

৪৪. আবূ দাউদ, ১৮১, তিরমিযি, হাদীস নং ৮২, নাসাঈ, হাদীস নং ১৬৩, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪৭৯

[৪৫] . مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، رقم الحديث- ١١٣٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، رقم الحديث-٧٠٢،
والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء انه لا يقطع الصلاة إلا الكلب و الحمار، المرأة، رقم الحديث-
٣٣٨، عن أبي ذر رضي الله عنه، و قال حسن صحيح.

৪৫. মুসলিম, হাদীস নং- ১১৩৯, আবূ দাউদ, , হাদীস নং ৭০২, তিরমিযি, , হাদীস নং ৩৩৮.

অষ্টম কারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কাজকে সাহাবাগণ সুন্নাত বা ওয়াজিব মনে করার ব্যাপারে মতানৈক্য।

এ অষ্টম কারণ সপ্তম কারণের অনেকটা কাছাকছি। যার ফলে এ দিকে সংক্ষিপ্ত আকারে ইশারা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা কোন কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আর নির্দেশটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে হতো। কতক শ্রবনকারী এ নির্দেশকে আবশ্যক ও পালন করা জরুরী মনে করেছেন। যার ফলে তাঁদের নিকট সে কাজ করা ওয়াজিব ও আবশ্যক ছিল। অন্য কতক শ্রবনকারী সে নির্দেশ মুতাবেক কাজ করাকে উত্তম মনে করেছেন। আবার আরেক দল এটাকে শুধু অনুমতি মনে করেছেন। অর্থাৎ ওয়াজিব বা উত্তম না বরং করলে করা যাবে এমনটি মনে করেছেন। এ প্রকার ভূক্ত হলো ওযুতে নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ। এ ক্ষেত্রে এক দল নির্দেশের বাহ্যিক দিক লক্ষ্য করে ওয়াজিব বলেছেন। অন্য এক দল লোক এটাকে মুস্তাহাব ও উত্তমের পর্যায়ে রেখেছেন। এমনিভাবে ঘুম থেকে উঠার পর ওযু করার পূর্বে হাত ধোয়ার নির্দেশকে এক দল লোক এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করে সে অবস্থায় হাত ধোয়া ওয়াজিব বলেছেন। পক্ষান্তরে অন্যদের মতে তা মুস্ত াহাব ও সুন্নাত পর্যায়ে ছিল। বাস্তবে এ মতানৈকটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। এই মতানৈক্য দূর করা মুজতাহিদ ও ফকীহ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এজন্য শুধু হুকুম সামনে আসলে প্রত্যেক ব্যক্তি বাধ্য যে, অন্যান্য নির্দেশ ও হুকুম আহকাম দেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যে, এই নির্দেশ বা হুকুম কোন পর্যায়ের। এক হাদীসে শেষ বৈঠকে বসে তাশাহুদ পড়ার নির্দেশ এসেছে।[৪৬] অন্য হাদীসে اقتلوا الاسودين فى الصلاة الحية والعقرب অর্থ,

---

[৪৬] . البخاري، كتاب الأذان، باب التشهد في الأخرة، رقم الحديث-٨٣١، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ومسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة؛ رقم الحديث- ٨٩٧، عنه رضي الله.

নামাযে দুই প্রানী সাঁপ ও বিচ্ছু হত্যা করো। নামাযে সাপ ও বিচ্ছু মারার নির্দেশ এসেছে।[৪৭] আর একথা স্পষ্ট যে, উভয় হুকুম এক পর্যায়ের নয়, একারণেই স্বয়ং ইমামদের মাঝেও মতানৈক্য হয়েছে যে, উক্ত সমস্ত হুকুম ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব বা উত্তমের পর্যায়ের? এসব কারণে ইমামগণের নিকট মতানৈক্য আছে যে, নামাজে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলা, রুকু সিজদায় স্থীর থাকার হুকুম, রুকু সিজদার তাসবীহ্ পাঠ করা, আত্তাহিয়্যাতু পড়া এসব হুকুম বা নির্দেশ ওয়াজিব নাকি সুন্নাত বা মুস্তাহব নাকি উত্তম পর্যায়ের। প্রত্যেক মুজতাহিদ অত্যান্ত মেহনত ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে অন্যান্য বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপন্থা, সাহাবাগনের কর্মপন্থা ও প্রাধান্য দেওয়ার নীতিমালাগুলো সামনে রেখে উক্ত বর্ণনাগুলোর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তাহকীকের পর প্রত্যেকটি হুকুমকে তার যথাস্থানে রেখেছেন। এসব আলোচনার দ্বারা মুজতাহিদের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করা যায়। আর এটাও বুঝা যায় যে তাকলীদ বা অনুস্বরন ছাড়া উপায় নেই। বুখারী শরীফের তরজমায় শুধু কোন কাজ করা বা না করার নির্দেশ দেখে এ কথা জানা যে এটা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব এটা কখনো সম্ভব না।

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম হাদীস পড়ানোর জন্য প্রথমে উসূলে ফেকাহ ও উসূলে হাদীস পড়া জরুরী মনে করেন। এ জন্যই উলামায়ে কেরাম আবশ্যক করেছেন যে, মুজতাহিদের জন্য কমপক্ষে কুরআনের

وابو داؤد كتاب الصلاة، باب التشهد، رقم الحديث- ٩٦٨، عنه رضي الله عنه،

والنسائ، كتاب الافتتاح، باب كيف التشهد الاول، رقم الحديث- ١١٦٧،

و ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب في التشهد، رقم الحديث- ٨٩٩، عنه رضي الله عنه.

৪৬. বুখারী, হাদীস নং ৮৩১, মুসলিম, হাদীস নং ৭৮৯৮, আবূ দাউদ, হাদীস নং ৯৬৮, নাসাঈ, হাদীস নং ১১৬৭, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৯.

[৪৭]. أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، رقم الحديث-٩٢١،

والترمذي- أبواب الصلاة، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، رقم الحديث- ٣٩٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

৪৭. আবূ দাউদ, হাদীস নং ৯২১, তিরমিযি, হাদীস নং ৩৯০.

ইলম অর্থাৎ তাঁর আহকামঃ খাস, আম, মুজমাল, মুহকাম, মুফাসসার, মুআওয়াল, নাসেখ, মানসুখ ইত্যাদি ইত্যাদি জানা আবশ্যক। আর ইলমে হাদীসের সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হওয়া অর্থাৎ বর্ণনার স্তরঃ মুতাওয়াতির, গায়রে মুতাওয়াতির, মুরসাল, মুত্তাসিল, সহীহ, মুআল্লাল, যয়ীফ, কওয়ী ও রেওয়ায়েতের স্তর জানা এগুলোর সাথে সাথে আভিধানিক দক্ষতা, নাহবী নিয়ম কানূন সম্পর্কে অবগত, সাহাবা ও তাবেয়ীদের কোন বিষয়ে একমত আর কোন বিষয়ে মতানৈক্য তা জানা জরুরী। উপরোক্ত সবগুলোর সাথে সাথে কিয়াসের বিভিন্ন ধরন ও প্রকার সম্পর্কে জানা থাকতে হবে।

নবম কারণ

কিছু হুকুম মেধা শক্তি তীক্ষ্ণ করার উদ্দেশ্যে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে কখনো কখনো কিছু হুকুম "মেধা শক্তি তীক্ষ্ণ করা" অর্থাৎ চিন্তা-ফিকির করার জন্য প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে টাখনুর নিচে লুঙ্গি ঝুলন্ত অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পুণরায় ওযু ও দ্বিতীয়বার নামায পড়তে বললেন।[৪৮] অন্য এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে খুব তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করলেন। নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন যাও পুনরায় নামায আদায় কর তোমার নামায হয়নি। সে দ্বিতীয় বার নামায আদায় করে দরবারে উপস্থিত হলে আবার একই নির্দেশ দিলেন। যাও পুনরায় নামাজ আদায় করো। তৃতীয় বার সে আরজ করল আমাকে বুঝিয়ে দিন আমার বুঝে আসছে না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[৪৮]. أبو داود، كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، رقم الحديث-٦٣٨، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال المنذري: في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه.

৪৮. আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৬৩৮

সাল্লাম তাঁকে স্থীর ও শান্তভাবে নামায আদায় করার কথা বললেন।[৪৯] এসকল স্থানে মতানৈক্য হওয়া আবশ্যক কেননা যে প্রত্যেক শ্রবনকারী এটাকে স্ব স্ব স্থানেই রাখবেন এটা আবশ্যক নয়। যদিও এ ধরণের মাসয়ালা কম কিন্তু এটা মতানৈক্যের কারণ সমূহের একটা কারণ।

দশম কারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু নির্দেশ চিকিৎসা শাস্ত্র আর কিছু নির্দেশ ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধির জন্য হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন উম্মতের জন্য প্রেরিত নবী তেমন খাদেমদের জন্য শারীরিক চিকিৎসক আর আশেকদের জন্য আত্মিক চিকিৎসক আবার প্রজাদের জন্য আমীর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতা-মাতার চাইতে অধিক দয়ালু ও মেহেরবান। উস্তাদ ও শায়েখের চাইতে অধিক তরবিয়্যত ও শিষ্টাচার শিক্ষা দানকারী ছিলেন। যদি দয়া মমতাময় সংক্রান্ত অসংখ্য হুকুম পাওয়া যায় তাহলে কঠোরতা ও সতর্কতার ভিত্তিতে অসংখ্য হুকুম পাওয়া যাবে। এটা এমন বিষয় যে ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ ও সংশয় নেই। সকলের কাছেই এটা স্পষ্ট। একারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক নির্দেশ ও ইরশাদ কোন এক প্রেক্ষিতে অবতীর্ন হলেও অন্য আরেক অবস্থার সাথে তা মিলে যাওয়া আবশ্যক ছিল। যদিও এগুলো এমন বিষয় যে, সেগুলোর প্রত্যেকটিকে সতন্ত্র একটি কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। কিন্তু আলোচনা অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে এর গুরুত্ব উপরোক্ত

---

[৪৯] . البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القرءاة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر و السفر، رقم الحديث-٧٥٧.

والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، رقم الحديث-٣٠٣.

والنسائ، كتاب الافتتاح، باب فرض التكبيرة الأولي، رقم الحديث- ٨٨٥.

وابن ماجه، كتاب الإقامة، باب إتمام الصلاة، رقم الحديث- ١٠٦٠. كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي، هذا حديث حسن صحيح.

৪৯. বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭, তিরমিযি, হাদীস নং ৩০৩, নাসাঈ, হাদীস নং ৮৮৫, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১০৬০.

আলোচনার চেয়েও বেশী। কিন্তু পাঠকদের বিরক্তির দিকে লক্ষ্য করে যা অধিকাংশ সময় দীর্ঘায়িত করার কারণে হয়ে থাকে এসব কারণগুলো একটি কারণের হিসেবে উল্লেখ করা হলো। আর সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুস্তাহাযা মহীলা অর্থাৎ যে মহিলার ধারাবাহীকভাবে রক্ত বের হয় তার ব্যাপারে বলেছেন সে যোহর, আসরের জন্য একবার গোসল করবে মাগরিব, ইশার জন্য দ্বিতীয়বার আর ফজরের জন্য তৃতীয়বার গোসল করবে।[৫০] উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন যে, উক্ত হাদীসে গোছলের হুকুম শরয়ী ছিল নাকি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে ওযু করার হুকুম বর্ণিত আছে।[৫১] এ ব্যাপারে এটাও বর্ণিত আছে যে, লজ্জাস্থান হলো দেহের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় একটি অঙ্গ, যেমনিভাবে অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু করতে হয় না তেমনিভাবে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলেও ওযু করতে হবে না।[৫২]

আল্লামা শা'রানী রহঃ বলেন যে, দ্বিতীয় হুকুমটি সাধারন মুসলমানদের জন্য আর প্রথমক্তো হুকুমটি উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য। এমনিভাবে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযুভঙ্গ হয়ে

---

[৫০]. أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما، رقم الحديث -٢٩٤. والنسائي، كتاب الحيض والاستحاضة، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، رقم الحديث-٣٦٠، عن عائشة رضي الله عنهما.

৫০. আবূ দাউদ, ,হাদীস নং ২৯৪, নাসাঈ, হাদীস নং ৩৬০।

[৫১]. أبو داود، كتاب الطهارة،باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث-١٨١.

৫১. আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮১

[৫২]. أبو داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم الحديث-١٨٢.
والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث-٨٥.
والنسائي في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث-١٦٥، كلهم عن طلق بن علي رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا أحسن شيئ روي في هذا الباب.

৫২. আবূ দাউদ, ,হাদীস নং ১৮২, তিরমিযি, হাদীস নং ৮৫, নাসাঈ, হাদীস নং ১৬৫।

যাবে।[৫৩] তবে এ সংক্রান্ত অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে ওযু ভঙ্গ হবে না।[৫৪] উলামায়ে কেরামের মাঝে এব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে উভয়ের মাঝে প্রাধান্য দেওয়া বা সমন্বয় করা হয়েছে। আল্লামা শা'রানী রহঃ এর মতে এক্ষেত্রেও একটি হুকুম উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য আর অন্যটি সাধারন উম্মাতের জন্য। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী এক জিহাদ সম্পর্কে من قتل قتيلا فله سلبه যে কোন কাফেরকে হত্যা করবে সে নিহত কাফেরের সাথে থাকা সমস্ত সামানা পেয়ে যাবে।[৫৫] কোন কোন ইমামের মতে উক্ত হুকুম সিয়াসী ও ব্যবস্থাপনা মূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসক হিসেবে উক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন এ জন্য আমীরের এই স্বধীনতা আছে যে জিহাদে ভালো মনে হবে সে জিহাদে এ ঘোষনা দিতে পারবে। অন্যদের মতে উক্ত হুকুম শরয়ী ছিল। সুতরাং সর্বদার জন্য ইহা আমলযোগ্য। আমীর কর্তৃক ঘোষনার উপর স্থগিত নয়। জিহাদের অধ্যায়ে মতানৈক্য সংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে।

---

[৫৩]. الموطأ للإمام مالك، كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، صـ ١٥، طبع هند، عن عبد الله عمر رضي الله عنهما.

৫৩. মুয়াত্তা লিল ইমাম মালেক, পৃষ্ট ১৫

[৫৪]. أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، رقم الحديث-١٧٨.

والترمذي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، رقم الحديث-٨٦.

وابن ماه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، رقم الحديث-٥٠٢، كلهم عن عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: وليس يصح في هذا الباب شيء.

৫৪. আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৭৮, তিরমিযি, হাদীস নং ৮৬ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৫০২

[৫৫]. البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، رقم الحديث-٣١٤٢.

ومسلم، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم الحديث-٤٥٦٨.

وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السلب يعطي القاتل، رقم الحديث-٢٧١٧.

والترمذي، كتاب السير، باب فيمن قتل قتيلا فله سلبه، رقم الحديث-١٥٦٢. كلهم عن أبي قتادة رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حسن صحيح.

৫৫. বুখারী, হাদীস নং ৩১৪২, মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৬৮, আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৭১৭, তিরমিযি, হাদীস নং ১৫৬২।

এমনিভাবে বর্গাচাষের নিষেধাজ্ঞার যে হাদীসগুলো আছে যেগুলোর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, এ নিষেধাজ্ঞা কৃষকদের উপর দয়ার উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। অনেকের কাছেই স্পষ্ট বিষয়।

এমনিভাবে রোজার অধ্যায়ে অনেককে অধিক সংখ্যায় রোজা রাখতে নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল তাঁদের উপর দয়া করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, তোমরা নিয়মিত রোজা রাখ ও রাত ভর নফল নামায পড়। তাঁরা আরয করলেন, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন এমন করো না। কখনো রোজা রাখবে আবার কখনো রোজা রাখবে না। এমনিভাবে রাতের কিছু অংশ নফল নামায আদায় করবে আর কিছু অংশ ঘুমাবে। কেননা তোমাদের উপর শরীরেরও হক্ব আছে। এরূপ করলে শরীরে ক্লান্তি আসবে না। তোমার উপর পরিবার পরিজনদেরও কিছু হক্ব আছে তাই দিন ও রাতে তাদের জন্য কিছু সময় থাকা উচিত। বন্ধু-বান্ধব ও সাক্ষাত প্রার্থীদেরও হক্ব রয়েছে। প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা ও এক মাসে এক খতমই যথেষ্ট। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তো এর চেয়েও বেশী সামার্থ্য আছে (তিনবার আরয করার পর) ইরশাদ করলেন যে, ঠিক আছে সওমে দাউদের চেয়ে বেশি রাখার অনুমতি নেই একদিন রোজা রাখা আর একদিন রোজা না রাখাকে সওমে দাউদ বলা হয়। এমনিভাবে সাত রাতের চেয়ে কম রাতে কুরআন খতম করার অনুমতি দেন নি।[৫৬] উক্ত বর্ণনার শব্দের মাঝে হাদীসের কিতাব সমূহে ভিন্নতা রয়েছে। এই হাদীস অনুযায়ী মেশকাত শরীফে বুখরী ও মুসলিমের উদ্ধৃতে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, সর্বদা রোজা রাখতে প্রথম থেকেই নিষেধ। এমনিভাবে হাদীসের শেষে দাউদী রোজার চেয়ে বেশি

---

[৫৬]. البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم الحديث- ١٩٧٨،
ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، رقم الحديث-٢٧٢٩.
والنسائي، كتاب الصيام، باب صوم يوم وافطار يوم، رقم الحديث-٢٣٩١، كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

৫৬. বুখারী, হাদীস নং ১৯৭৫, মুসলিম, হাদীস নং ২৭২৯

রোজা রাখার নিষেধাজ্ঞা এগুলো সব তাঁর উপর স্নেহ ছাড়া আর কি হতে পারে? এ জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. স্বীয় বার্ধক্য ও দূর্বলতার সময় আক্ষেপ করে বলতেন হায় কতই না উত্তম হতো যদি সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া রুখসত গ্রহণ করতাম! এমনিভাবে সতর্কতা ও কঠোরতার প্রকারভূক্ত অনেক বর্ণনা হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ لاصوم من صام الدهر যে সারা জীবন রোজা রাখে তার রোজা কিছুই নয়।[৫৭] একদল উলামার মতে এই ইরশাদ সর্তকতা ও সাবধানতা অর্থাৎ ধমকী হিসেবে বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য নয় যে, সে রোজার কোন সওয়াব পাবে না অথবা তার রোজা একেবারে হবেই না। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ব্যভিচার ব্যভিচারের সময়, চোর চুরির সময় মুমিন থাকে না।[৫৮] এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ মদখোরের নামায চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবূল হয় না।[৫৯] تلك عشرة كاملة (এ মোট দশটি পূর্ণ হল)

---

[৫৭]. البخاري، كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، رقم الحديث-١٩٧٩.

و مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، رقم الحديث-٢٧٣٤، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله.

৫৭. বুখারী, হাদীস নং ১৯৭৯, মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩৪

[৫৮]. البخاري، كتاب المظالم، باب النهبة بغير اذن صاحب، رقم الحديث-٢٤٧٥،

مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، رقم الحديث-٢٠٢،

وأبو داود، كتاب السنة، باب الدليل علي زيادة الإيمان و نقصانه، رقم الحديث-٤٦٨٩،

والترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، رقم الحديث-٢٦٢٥،

والنسائي، كتاب السارق، باب تعظيم السرقة، رقم الحديث-٤٨٧٤،

و ابن ماجه، كتاب الفتن، باب النهي عن النهبة، رقم الحديث-٣٩٣٦، كلهم رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.

৫৮. বুখারী, হাদীস নং ২৪৭৫, মুসলিম, হাদীস নং ২০২, আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৬৮৯, তিরমিযি, হাদীস নং ২৬২৫, নাসাঈ, হাদীস নং ৪৮৭৪, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৩৬

[৫৯]. أبو داود، كتاب الأشربة، باب ما جاء في السكر، رقم الحديث-٣٦٨٠.

والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، رقم الحديث-١٨٦٢.

উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি কারণ বর্ণনা করা হলো। অন্যথায় কারণগুলো উক্ত কয়েকটির মাঝে সীমিত নয়। বরং শুধু এ কথা স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল যে, বর্ণনার ভিন্নতার মূলে এমন কিছু কারণ রয়েছে যার থেকে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর হওয়া উচিতও ছিল। মতানৈক্যের কারণ সমূহ কোন সংক্ষিপ্ত লেখা বা রচনায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব না আর আমার মত অধমের দ্বারা সীমিত করা সম্ভবও নয়। এ ক্ষেত্রে মূল যে উদ্দেশ্য ছিল তা পূর্বোক্ত আলোচনা গুলোর দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে আদায় হয়ে গেছে। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনার ভিন্নতা বাস্তবেই বিভিন্ন কারণে হয়েছে। আর সে কারণগুলো অনেক। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো। এর পর দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ সাহাবীদের যুগে উপরোক্ত কারণ ছাড়াও এমন অনেক কারণ ছিল যার ফলে বর্ণনার ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলোরও কয়েকটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি। কিন্তু এখানে অতিরিক্ত একটি প্রশ্ন হতে পারে এজন্য প্রথমেই সে প্রশ্ন উল্লেখ করছি এরপর দ্বিতীয় যুগের কারণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবো।

প্রশ্নঃ এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু উম্মাতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রেরীত হয়েছিলেন আর যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের উল্লেখযোগ্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল। তাহলে তিনি কেন সমস্ত হুকুম আহকাম বিস্তারিত ও স্পষ্ট করে শিক্ষা দিলেন না? তাহলে এই সমস্যা হতো না ও কোন ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি হতো না।

উত্তরঃ বাহ্যিকভাবে শুনলে তো মনে হয় যে এ প্রশ্ন যথার্থ। বাস্তবে এমনটি নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতের উপর সীমাহীন দয়ালু ছিলেন। যারফলে শাখাগত মাসআলার সবগুলোর

وابن ماجه كتاب الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، رقم الحديث-٣٣٧٧، كلهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه' إلا أبا داود فإنه رواه عن ابن عباس. وقال الترمذي: حسن.

৫৯. আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৬৮০, তিরমিযি, হাদীস নং১৮৬২, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৩৭৭

নিদৃষ্ট কোন নিয়ম বলে যান নি। যদ্বারা উম্মাতের কষ্ট হয়। বরং দ্বীনি আহকামগুলোকে নিম্নোক্ত দুইভাগে বিভক্ত করে গেছেন। (১) এমন সব মাসয়ালা যেগুলোর ক্ষেত্রে চিন্তা-ফিকির ও তর্ক-বিতর্ক করাকে অপছন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন। (২) এমন সব মাসয়ালা যেগুলোতে মতনৈক্য করাকে রহমত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং উম্মাতের সহজতার জন্য প্রত্যেকটি কর্মকে চাই তা ভূল-ই হোক না কেন প্রতিদান ও সওয়াবের ওসিলা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, তবে এই শর্তে যে যদি তা বেপরওয়ায়ী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত না হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, শরীয়ত হুকুম আহকামকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। তম্মেধ্যে এক প্রকার হলো অকাট্য, যেগুলো পালন করার ক্ষেত্রে পালনকারীদের জন্য চিন্তা-ফিকির করার কোন সুযোগ রাখা হয় নাই এবং স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোতে ব্যাখ্যা ও মতামত দাড় করানোর কোন সুযোগ রাখা হয় নাই। বরং ব্যাখ্যাকারীকেও ভুল ও গোমরাহ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ঐ সমস্ত হুকুম আহকাম যেগুলোতে শরীয়ত সংকীর্ণতা রাখে নাই। বরং উম্মাতের দূর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে উম্মাতের সহজতার প্রতি দৃষ্টি রেখেছে। সেগুলোতে নিজের পক্ষ থেকে যুক্তি সংগত কারণে এবং ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে আমল না করলে ভুল ও বদ্দীন বলে আখ্যায়িত করা হয় নাই। প্রথম প্রকারকে اعتقادیه ইতিকদিয়্যাহ (আকীদা বিশ্বাস) বলে আর দ্বিতীয় প্রকারকে জুযইয়্যিাহ, ফরইয়্যাত, (শাখাগত মাসয়ালা) ইত্যাদি ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে বাস্তব কথা হলো শরীয়তই এটাকে সংকীর্ণতা রাখেনি। সুতরাং শরিয়তের পক্ষ থেকে যদি এগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাথে বর্ণিত হতো তাহলে এ দ্বিতীয় প্রকারও প্রথম প্রকারের মতো হয়ে উম্মাতের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে যেতো। আর বাস্তবতা হলো এই যে, তখনও মতানৈক্য থেকে মুক্ত থাকা মুশকিল হতো। কেননা সকল বিষয় তো শব্দের মাধ্যমেই বর্ণিত হতো আর শব্দের প্রয়োগস্থল বিভিন্ন হওয়ার সম্ভবনা আছে। মোটকথা পবিত্র শরীয়ত সমস্ত আহকামকে উসূল, ফুরু (মূল, শাখাগত) ও নির্দেশে বন্টন করে প্রথম বিষয়ে মতানৈক্য করাকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে যেমন নিম্নোক্ত

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (سورة الشورى - ١٣)

অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। (সূরা শুরা-১৩)

এ আয়াতে দ্বীনি বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকারে মতানৈক্য করাকে উম্মাতের জন্য রহমত বলা হয়েছে আর এ কারণে-ই এ প্রকারের মতানৈক্যের ব্যাপারে নবীর যুগেরও এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলোতে কঠোরতা আরোপ করা হয় নি।

উদাহরণ হিসেবে দুইটি ঘটনার প্রতি ইশারা করা হলো। নাসাঈ রহ. হযরত তারেক ইবনে শিহাব রা. এর সূত্রে দুই সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর তা হলো দুই জন জুনুবী (গোসল ফরজ হয়েছে এমন) সাহাবী তাদের একজন পানি না পাওয়ার কারণে নামায আদায় করেন নি (সম্ভবতঃ তায়াম্মুমের আয়াত তখন নাযিল হয় নি অথবা নাযিল হলেও তাঁর কাছে এর সংবাদ পৌঁছে নাই) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সঠিক বললেন আর এক সাহাবী তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকেও সঠিক বললেন।[৬০]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জামাতকে বনূ কুরায়জায় পৌঁছে আসর নামায আদায় করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেয়ে ঐ জামাতের কিছু লোক সেখানেই আসর নামায আদায় করার হুকুমকে মূল হুকুম হিসেবে মনে করেন এবং পথিমধ্যে নামায আদায় করলেন না। নামায বিলম্ব হলেও তাঁরা বাহ্যিক নির্দেশ পালনকে আবশ্যক

---

[৬০]. النسائي، كتاب الغسل و التيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، رقم الحديث-٤٣٥، عن طارق بن شهاب رضي الله عنه.

৬০. নাসাঈ, হাদীস নং ৪৩৫।

মনে করেছেন। তাদের কেউ উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য দ্রুত পৌছা মনে করে পথিমধ্যেই তাঁরা আসর নামায যথা সময়ে আদায় করেনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় দলকে কোন প্রশ্ন করেননি। বুখারীতে উক্ত ঘটনা বিস্তারিত রয়েছে।[৬১] এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা রয়েছে।

সুতরাং শাখাগত মাসয়ালায় মতানৈক্য আর মৌলিক (উসূলী) মাসয়ালায় মতানৈক্য ভিন্ন বিষয়। যে সকল ব্যক্তি উক্ত মতানৈক্যকে উসূলী মতানৈক্যের মতো মনে করে এমন আয়াত ও হাদীস এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায় যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস নিন্দনীয় মতানৈক্য সংক্রান্ত। এটা তাদের অজ্ঞতা ও ধোকা মাত্র। এতে সামান্য সন্দেহ নেই যে, পবিত্র শরীয়ত উক্ত শাখাগত মাসয়ালার মতানৈক্যকে বড় প্রশস্তাও সহজ করে দিয়েছে। যদি এরুপ না হতো তাহলে উম্মাতের সাধ্যের বাহিরে হয়ে যেতো। এ কারণে-ই হযরত হারুন আররশীদ যখনই ইমাম মালেক রহঃ এর কাছে এই আবেদন করলেন যে, হযরত ইমাম মালেক যেন 'মুওয়াত্তা ইমাম মালেক' বায়তুল্লাহ শরীফে টানিয়ে দেন যাতে করে সমস্ত মানুষ উহা পাঠ করে সে অনুযায়ী আমল করতে পারে এবং কোন মতানৈক্য না থাকে। হযরত ইমাম মালেক রহ. উক্ত আবেদন কোন অবস্থায় গ্রহণ করেন নি এবং তিনি সর্বদা এই উত্তর দিতেন যে, সাহাবাগন ফরয়ী (শাখাগত) মাসআলায় মতানৈক্য করতেন আর তাঁরা সঠিক ছিলেন এর বিভক্তির ক্ষেত্রে উভয় দলের মত ও পথ আমলযোগ্য ছিল। এমনিভাবে যখন মানসূর হজ্জ করল তখন হযরত ইমাম মালেকের রহ. কাছে আবেদন করল যে, আপনি আপনার পান্ডলিপি সমূহ আমাকে দিয়ে দিন যাতে করে আমি সেগুলোর কপি সকল মুসলিম শহরে প্রচার করতে পারি এবং মুসলমানদের কে নিদেশ দিয়ে দিবো যে, তাঁরা যেন ইহা লংঘন না করে। তখনও হযরত ইমাম মালেক রহ. উত্তরে বললেন আমীরুল মু'মেনীন আপনি কক্ষনই এমন

[৬১] . البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلي الله عليه و سلم و مخرجه إلي بني قريظة، رقم الحديث-٤١١٩ .

৬১. বুখারী, হাদীস নং ৪১১৯

করবেন না। মানুষের কাছে রাসূলের হাদীস ও বাণী সমূহ পৌঁছে গেছে ও সে অনুযায়ী আমল করছে আর তাঁদেরকে সে অনুযায়ী আমল করতে দিন। ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণীর উদ্দেশ্য "আমার উম্মাতের মতানৈক্য রহমত স্বরুপ"।[৬২] আর ইহাই সেই স্পষ্ট রহমত যা চোখে দেখা যাচ্ছে।

বর্তমানে প্রত্যেক ইমামের নিকট মতানৈক্যপূর্ণ মাসয়ালা রয়েছে, প্রয়োজন বশতঃ অন্য ইমামের মাযহাবের উপর ফাতওয়া দেওয়া জায়েয আছে। পক্ষান্তরে যদি এই মতানৈক্য না হতো তাহলে কোন প্রয়োজন বশতঃ ও ইজমা অথবা ঐক্যমতপূর্ণ মাসয়ালা বর্জন করা জায়েয হতো না। মোটকথা ইমামগনের এই মতানৈক্য শরীয়তের কাম্য ছিল। যাতে শুধু উল্লেখিত একটি মাত্র ফায়দা-ই নয় বরং আরো অনেক ফায়দা রয়েছে। যদি সময় হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ "তৃতীয় যুগের" আলোচনায় সামনে আসবে। এখানে তা আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু ইহা প্রয়োজন ছিল যে, যারা ফেকহী মাসআলা সমূহের উপর সামান্যও ধারণা রাখে তারা ইহার উপকারিতা খুব সহজেই বুঝতে পারবে।

আল্লামা শা'রানী রহ. রচিত "আল- মিযান" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় বৎস! যদি তুমি ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখ তাহলে দেখবে যে, এবং স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, চার ইমাম ও তাঁদের অনুসারীরা সকলেই হেদায়েতের উপর ছিলেন এরপর কোন ইমামের কোন অনুসারীর উপর আপত্তি আসবে না। এই বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝে আসবে যে চার ইমামের কর্মপন্থা পবিত্র শরীয়তের আলোকেই ও তাঁদের মতানৈক্য পূর্ন বিভিন্ন উক্তি উম্মাতের জন্য রহমত স্বরুপ হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা যিনি সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় তাঁর নির্দেশের দাবী ছিল উক্ত কল্যাণ। যদি আল্লাহ তা'য়ালার এটা পছন্দনীয় না হতো তাহলে এটাকে হারাম করে দিতেন যেভাবে হারাম

---

[৬২]. فيض القدير، ٢١٢/١، وقال المناوي: قال السبكي: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له علي سند صحيح ولا ضعيف، ولا موضوع، وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ اختلاف أصحابي رحمة،

৬২. ফয়জুল কাদীর, ১/২১২

করে দিয়েছেন দ্বীনের উসূল (মৌলিক মাসয়ালা) সম্পর্কে মতানৈক্যকে। প্রিয় বৎস! তোমার কাছে এ বিষয় সাদৃশ্য হয়ে যেতে পারে যে, ইমামগনের ফরয়ী (শাখাগত মাসয়ালায়) মতানৈক্যকে উসূলী মতানৈক্যের সাদৃশ্য ও তার হুকুম ভূক্ত মনে করবে যে কারণে তুমি ধ্বংসের দিকে চলে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উম্মতের ফরয়ী (শাখাগত মাসয়ালার) মতানৈক্যকে রহমত সাব্যস্ত করেছেন।

বাস্তবে ইমামগনের সমস্ত মতানৈক্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেরাগদানী (হাদীস ভান্ডার) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ইমামগনের মতানৈক্য ও বিভিন্ন উক্তির মাঝে এতটুকু ব্যবধান রয়েছে যে, কোন শরয়ী হুকুমকে কোন ইমাম আসল হুকুম ও আযীমত (দৃঢ়ভাবে পালনীয়) সাব্যস্ত করেছেন। অন্য ইমাম সেটাকে রুখসত (করার সুযোগ) সাব্যস্ত করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমি ইমামগনের বিভিন্ন মতের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকারের কথা বলছি যে যার মন চাবে কোন হুকুমকে আযীমত হিসেবে আমল করবে আর যার মন চাবে সে রুখসতের উপর আমল করবে। উক্ত আলোচনা দ্বারা কোন ইলম অন্বেষনকারীর এই ধারণা হতে পারে, না, না কক্ষনো এরুপ নয়। কেননা তাহলে তো দ্বীনকে নিয়ে খেলা করা বরং প্রত্যেক ইমাম ঐ দুই পদ্ধতীর মধ্য থেকে একটিকে নির্বাচন করেছেন। কিন্তু যা নির্বাচিত তা তাঁর অনুসারীদের জন্য আবশ্যকীয় পদ্ধতি। আমি উপরে যে কয়েকটি মত সাব্যস্ত করেছি তা শুধু মাত্র ইমামগনের প্রতি সুধারণার কারণেই নয় বরং প্রত্যেক ইমামের বাণীসমূহ ও সেগুলোর উৎস স্থল ও দলীলসমূহ তালাশ করার পর নির্বাচন করেছি। যে ব্যক্তি আমার এই কথা বিশ্বাস না করে সে যেন আমার المنهج المبين فى ادلة المجتهدين নামক কিতাবে দেখে নেয়। দেখার পর সে আমার কথা মেনে নিবে। কেননা আমি তাতে প্রত্যেক ইমামের দলীলগুলো একত্রিত করেছি আর উহার পর এই সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করেছি যে, তাঁরা সকলেই হেদায়েতের উপর ছিলেন।

বাস্তবতা হলো যে, যতক্ষন পর্যন্ত কোন কামেল শায়েখের সংস্পর্শে সুলূকের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম না করবে উহার বাস্তবতা যথাযথভাবে স্পষ্ট হবে না। সুতরাং যদি তুমি উহার স্বাদ গ্রহণ করতে চাও তাহলে কোন কামেল পীরের কাছে যেয়ে রিয়াজত করো যাতে উহার বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আমি এতে সামান্যতম বাড়িয়ে বলি নি বরং এ ব্যাপারে মাশায়েখের কথায় উহার সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং শায়খুল মাশায়েখ মহীউদ্দীন ইবনে আরবী "فتوحات مكيه" নামক কিতাবে লেখেন যে, "মানুষ যখন কোন বিশেষ মাযহাবের অনুসারী হয়ে বিভিন্ন ধাপে উন্নিত হয় তখন শেষ পর্যায়ে সে এমন সমুদ্রে পৌঁছে যা সমস্ত ইমামদের দ্বারা ভরপুর তখন তার সমস্ত ইমামগনের মাযহাব হক্ব হওয়ার বিশ্বাস হবে। এর উদাহরণ ঠিক রাসূল গণের মত যখন ওহীর প্রত্যক্ষ দর্শণ হতো সে সময় পূর্ণ শরীয়তের প্রত্যক্ষ দর্শণ হয়ে যেত। (সংক্ষিপ্ত)

আল্লামা শা'রানী উক্ত বিষয়টি যা প্রায় ১০০ পৃষ্টা ব্যাপী যা স্বর্ণ অক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। বাস্তবে এই উদ্দেশ্যে অসংখ্য কল্যাণ ও উপকারীতা রয়েছে। তা অনুবাদ করে সতন্ত্রভাবে ছাপানো উচিত। এখানে শুধু এ পরিমান ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, বাস্তবে ইমামগনের এই মতানৈক্য বাহ্যিকভাবে ভিন্নতা বুঝা যায় কিন্তু হাকীকতে এতে কোনো ভিন্নতা বা বিভক্তি নেই। আর এর যে পর্যায়ে আছে সে পর্যায়েই থাকা এক অত্যাবশ্যক বিষয় যা না হলে উম্মাতের জন্য খুবই সংকীর্ণতার কারণ হতো। আর যেহেতু এই মতানৈক্য বর্ণনার ও হাদীস সমূহের ভিন্নতার ফলাফল। এ জন্য এটাও দ্বীনি কল্যানের দাবী ছিল যে, সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হোক। যদি সেগুলোকেও শরয়ী আকীদার মত অকাট্য আকারে অবতীর্ণ করা হতো তাহলে ইমামগনের মতানৈক্যের কোন সুযোগ থাকত না। আর তখন মতানৈক্য করা পথভ্রষ্টতার কারণ হতো। মতানৈক্য না থাকায় উম্মাতের জন্য সংকীর্ণতার কারণ হতো কিন্তু এর অর্থ এটাও নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী দলীল সমূহ থেকে মাসয়ালা বের করে সে অনুযায়ী আমল করবে চাই তার সেই যোগ্যতা থাকুক বা না

থাকুক। এটা গোমরাহ হওয়ার অন্যতম কারণ। আর এই মতানৈক্য প্রশংসীতও নয়। বরং প্রশংসীত মতানৈক্য হল যা শরয়ী নীতিমালা ও মূলনীতি অনুযায়ী হয়। জানাবাতের গোছল সম্পর্কীয় ঘটনা শুধু নিজ বুঝ অনুযায়ী মাসয়ালা বেরকারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্খ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬৩]

فله الحمد علي ما يسر لنا الدين فإنه لطيف خبير رءوف بعباده بصير.

দ্বিতীয় যুগ

আছার (সাহাবাদের বাণী) এর ভিন্নতার কারণসমূহ

প্রথম কারণ

রেওয়ায়েত বিল মা'না বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মূল অর্থ ঠিক রেখে ভিন্ন শব্দে হাদীস বর্ণনা করা।

প্রথম প্রকারে বর্ণিত কারণ সমূহ ছাড়াও সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে আরো এমন কিছু কারণ রয়েছে যেগুলোর ফলে হাদীসের বর্ণনার ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আর এমনটি হওয়াও আবশ্যক ছিল। তার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো রেওয়ায়েত বিল-মা'না অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রাথমিক যুগে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হুবহু মূল শব্দে হাদীস বর্ণনা করার প্রতি গুরুতারোপ করা হতো না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নিজেদের ভাষায় বা শব্দে বর্ণনা করে দিতেন যেমন ঃ

كما فى مصنف عبدالرزاق عن ابن سيرين "كنت اسمع الحديث من عشرة كلهم يختلف فى اللفظ والمعنى واحد."[٦٤]

---

৬৩. أبو داود، كتاب الطهارة، باب المجروح يتيمم، رقم الحديث-٢٣٦،٣٣٧،

وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب في المجروح يصيبه الجنابة، رقم الحديث-٥٧٦، عن جابر و عبد الله بن رضي الله عنهما.

৬৩. আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৩৬, ৩৩৭, ইবনে, হাদীস নং ৫৭৬.

৬৪. مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث-٢٠٨٣٨، عن أبن سيرين، ٦٨٢/١٠، طبع دار الكتب العلمية.

অর্থাৎ হযরত ইবনে সীরীন রহঃ, বলেন, আমি একই হাদীস দশ জন উস্তাদ থেকে শুনেছি যাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন কিন্তু অর্থ ছিল এক। তাযকিরাতুল হুফফাজ নামক কিতাবে আল্লামা যাহাবী রহ. আবূ হাতেম রহ. এর নিম্মোক্ত বানী বর্ণনা করেন ঃ

ولم ارمن المحدثين من يحفظ ويأتى بالحديث علي لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة

অর্থাৎ কবীসা ব্যতীত আমি অন্য কোন মুহাদ্দীসকে এমন পায়নি যারা হুবহু হাদীসের শব্দ বর্ণনা করে।[৬৫] আল্লামা সূয়ূতী রহ. 'তাদরীবুর রাবী' নামক কিতাবে উক্ত বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেখানে উলামাগনের মতানৈক্যের ব্যাপারেও বর্ণনা করেছেন যে, রেওয়ায়েত বিল-মা'না জায়েয আছে কিনা? তবে চার ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, বর্ণনার সকল শর্ত কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে তার জন্য রেওয়ায়েত বিল মা'না করা জায়েয। তবরানী ও ইবনে মানদাহ রহ. এর একটি হাদীস দ্বারা উক্ত মতের সমর্থনে দলীল পেশ করেছেন যে হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি যে শব্দে হাদীস শুনি তা হুবহু মনে রাখতে পারিনা এক্ষেত্রে আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যদি অর্থ ঠিক থাকে তাহলে শব্দের পরিবর্তন করেও বর্ণনা করা জায়েয।[৬৬] আর বাস্তবে পূর্ণ শব্দ মনে রাখাও কষ্টকর।

এ কারণেই যখন হযরত ওয়াছেলাহ ইবনে আসকা রা. এর কাছে মাকহুল রহ. এই আবেদন করেছিলেন যে আমাকে এমন একটি শোনান যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন এবং যার কোন ধরনের কম বেশী, ভুল-ভ্রান্তি নেই। তখন তিনি মাকহুল রহ. কে

---

৬৪. মুসান্নেফ আঃ রাজ্জাক হাদীস নং ২০৮৩৮, আন ইবনে সিরিন, ১০/৬৩২.

[৬৫] . تذكرة الحفاظ رقم الترجمة-٣٧٠، وتهذيب الكمال رقم الترجمة-٥٤٣٢.

৬৫. তাযকিরাতুল হুফফাজ, শিরোনাম নং -৩৭০, তাহযীবুল কামাল, শিরোনাম নং - ৫৪৩২

[৬৬] . المعجم الكبير للطبراني-١١٧/٧، ومجمع الزوائد-١٥٤/١، عن أكيمة الليثي رضي الله عنه.

৬৬. আল-মু'জামুল কাবীর, তবরানী রহ কর্তৃক, ৭/১১৭, মাজমাউয যাওয়ারেদ ১/১৫৪

জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাদের কেউ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছো? মাকহুল রহ. বললেন এমন ভালো কোন হাফেজ নেই যে তার কোন ভুল হয় না। এর পর ওয়াছেলাহ রা. বললেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার কালাম যা তোমাদের কাছে লিখিত ও সংরক্ষিত রয়েছে, শব্দ সংরক্ষনের জন্য সীমাহীন গুরুত্ব দেওয়া হয় এরপর ও তাতে 'ওয়াও' এবং 'ফা' এর ভুল (ছোট বড় বিভিন্ন ভুল) থেকে যায়, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস হুবহু সেভাবে কি করে শুনানো যাবে? তাছাড়া হাদীসগুলো কখনো কখনো এক বারই শুনার সুযোগ হয়েছে। সুতরাং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল অর্থ ঠিক থাকা-ই যথেষ্ট মনে কর।

হযরত ওয়াকী রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে যদি অর্থ আদায় হয়ে যাওয়ার সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে উম্মাত ধ্বংস হয়ে যাবে। ইবনূল আরাবী রহ. এর মতে বর্ণনা বিল-মা'না (মূল অর্থ ঠিক রেখে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা) শুধু সাহাবীগণের জন্য-ই জায়েয অন্য কারো জন্য জায়েয নেই। কিন্তু কাসেম বিন মুহাম্মাদ, ইবনে সীরীন, হাসান, জুহরী, ইবরাহীম, শা'বী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের মতে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে অন্যান্যদের জন্যও জায়েয। এই মৌলিক কারণে-ই তাবেয়ীদের একটি বড় দল বর্ণনা কে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্মন্ধ করতেন না বরং মাসয়ালা আকারে ঐ হাদীসকে শরয়ী হুকুমের অধিনে বর্ণনা করতেন।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সরাসরি সম্বন্ধ না করার জন্য একাধিক কারণ থেকে এটাও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ যে, শব্দ পরিবর্তন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্বন্ধ করে বর্ণনা করা জঘন্য তম অন্যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভুল সম্বন্ধ করার কঠিন ধমকীর অন্তর্ভূক্ত না হয়ে যায়। এ জন্য আকাবীর উলামাগন সর্বদা-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্বন্ধ থেকে বেঁচে থাকতেন। আর এটা এজন্য যে, কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি বা ভুল

বুঝার সম্ভাবনা সেই হাদীসে না থাকা কঠিন বিষয়। একারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর মতো সম্মানিত সাহাবী যার সম্পর্কে আবূ মূছা আশয়ারী রা. বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এত বেশি আসা-যাওয়া করতেন যারফলে আমরা মনে করতাম যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার ভূক্ত। তিনি ঐ ব্যক্তি যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের গোপন কথা শোনারও অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জীবদ্দশায় কুরআনের ও হাদীসের উস্তাদ বানিয়েছেন। তিনি ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ হলো যদি আমি পরামর্শ ছাড়া কাউকে আমীর বানাতাম তাহলে ইবনে মাসউদকে আমীর বানাতাম। তিনি ঐ ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ধরনের বাঁধা বিপত্তি ছাড়াই আসা-যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৬৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ইলমি ফযীলত সংক্রান্ত যত কিছু বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য সাহাবাগনের ক্ষেত্রে তা খুব কম-ই বর্ণিত হয়েছে। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা রহ., নিজ মাযহাবের বিশেষ উৎসস্থল ইবনে মাসউদ রা. কে গ্রহণ করেছেন। যার আলোচনা যথোপযুক্ত স্থানে ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, এত অধিক ফযীলত, অধিক ইলম ও অধিক পরিমানে হাদীসের জ্ঞান থাকা স্বত্বেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি খুব কম-ই হাদীসের সম্বন্ধ করতেন। হযরত আবূ আমর শাইবানী রহ. বলেন, আমি এক বৎসর পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম এই দীর্ঘ সময়ে আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্বন্ধ করে কোন হাদীস

---

[৬৭]. الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عبد الله بن مسعود، رقم الحديث-٣٨٠٨،
وابن ماجه، كتاب السنة، باب فضل عبد الله بن مسعود، رقم الحديث-١٣٧،عن علي رضي الله عنه،
وقال الترمذي: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي.

৬৭. তিরমিযি, হাদীস নং ৩৮০৮, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩৮।

বর্ণনা করতে শুনি নাই। ঘটনাক্রমে যদি কখনো قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বলে ফেলতেন তখন শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেত। হযরত আনাছ রা. যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাছ খাদেম ছিলেন তিনি বলেন যদি আমার ভুল-ভ্রান্তির ভয় না থাকত তাহলে আমি এমন অনেক হাদীস শুনাইতাম যেগুলো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। কিন্তু আমার ভয় হয়, আমি ধমকীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাই কিনা। হযরত সুহাইব রা. বর্ণনা করেন ঐ সকল জিহাদের কথা যেগুলো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক ছিলাম বর্ণনা করে দিব কিন্তু এভাবে বলা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলেছেন, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এধরনের আরো অনেক ঘটনা আছে যেগুলোতে সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্বন্ধ না করার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ একটু ব্যাখ্যা সহকারে এ বিষয়ে ঐ স্থানে আলোচনা করবো যেখানে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর হাদীস কম বর্ণনা করা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এ স্থানে উল্লেখিত ঘটনাসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো হুবহু শব্দ সহকারে হাদীস বর্ণনা করা যেহেতু কষ্টকর, সেহেতু রেওয়ায়েত বিল-মা'না (মূল অর্থ ঠিক রেখে ভিন্ন শব্দে হাদীস) বর্ণনা করা হয় এজন্য বুযুর্গ সাহাবাগন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্বন্ধ কম করতেন। আর যখন বর্ণনা বিল-মা'না (মূল অর্থ ঠিক রেখে ভিন্ন শব্দে হাদীস) প্রমানিত হলো তখন এর জন্য মতানৈক্য আবশ্যক হয়ে গেল। কেননা উপস্থপনার ভিন্নতার কারণে বর্ণনার ভিন্নতা হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর রা. যে খুৎবা দিয়েছেন তাতে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করে বলেছিলেন যে, এটা উম্মাতের মাঝে মতানৈকের কারণ হবে।

দ্বিতীয় কারণ

কোন হুকুম রহিত হওয়ার পর সে সম্পর্কে না জানা

সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে বর্ণনার ভিন্নতা হওয়ার এটাও একটি কারণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটি হুকুম দিয়েছিলেন সে সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তা শুনে বুঝে নিয়েছেন। পরবর্তীতে সে হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু যারা উপস্থিত ছিলেন না তাঁরা প্রথমবার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ থেকে শুনেছেন। আর তাঁরা যেভাবে শুনেছেন ঐ ভাবেই বর্ণনা করেছেন।

বিভিন্ন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ীর উপর মাছাহ করার কথা পাওয়া যায়।[৬৮] পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ রহঃ কর্তৃক রচিত মুওয়াত্তা নামক কিতাবে বর্ণনা করেন যে, পাগড়ীর উপর মাছাহ করা সম্পর্কে আমার কাছে যতটুকু পৌছেছে তা হল এটা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে।[৬৯] এমনি ভাবে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, জুমা'র গোছল প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।[৭০]

---

[৬৮]. البخاري، كتاب الوضوء، باب المسح علي الخفين، رقم الحديث-٢٠٥.

ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح علي الناصية والعمامة، رقم الحديث-٦٣٣.

والترمذي، كتاب الطهارة، باب المسح علي العمامة، رقم الحديث-١٠٠.

والنسائي، كتاب الطهارة، باب المسح علي العمامة، رقم الحديث-٥٦٢، كلهم عن المغيرة بن شعيب إلا البخاري فإنه رواه عن جعفر بن عمرو عن أبيه.

৬৮. বুখারী, হাদীস নং ২০৫, মুসলিম, হাদীস নং ৬৩৩, তিরমিযি, হাদীস নং ১০০, নাসাঈ, হাদীস ৫৬২.

[৬৯]. الموطأ للإمام محمد، كتاب الطهارة، باب المسح علي العمامة، رقم الصفحة-٧١، طبع هند.

৬৯. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা নং ৭১.

[৭০]. البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم الحديث-٨٧٩.

ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب و السواك يوم الجمعة، رقم الحديث-١٩٦٠.

وأبو داود، باب في الغسل يوم الجمعة، رقم الحديث-٣٤١، كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত নিদের্শ ইসলামের প্রথম যুগে দিয়েছিলেন। কেননা তাঁরা নিজেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করতেন। আর্থিক সংকীর্নতার কারণে কর্মচারী বা অন্য কাউকে রাখতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁরা মোটা কাপড় পরিধান করতেন। বিধায় কাজ করার সময় ঘাম ইত্যাদির কারণে দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে যেত। তাছাড়া মসজিদ ছিলো সংকীর্ন ফলে জুমার নামাজের জন্য সবাই একত্রিত হলে ঘামের দুর্গন্ধ নামাযীদের জন্য কষ্টদায়ক হতো। এ জন্য গোছল ও সুগন্ধি ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন পরবর্তীতে আল্লাহ তা'য়ালা প্রশস্ততা দান করেন ও মসজিদ প্রশস্ত হয়ে যায়। সুতরাং তখন সেই নিদের্শ আগের মতে থাকে নি।[৭১]

এই প্রকার ভূক্ত হলো হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণিত হাদীস যে আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযু ভেঙ্গে যায়। পক্ষান্তরে হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ আমল ছিল আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযু ভঙ্গ হবে না।[৭২] এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হল যে, ওযুর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু আবূ দাউদ রহঃ এর মতে জাবের রা. হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয়। এই কারণেই আমরা অন্য আরেকটি বর্ণনা পেশ করছি যাদের মতে আগুন দ্বারা পাকানো খাবারের পর যে ওযুর কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য আভিধানিক ওযু। অর্থাৎ হাত-মুখ ধোয়া। পারিভাষিক ওযু নয়।[৭৩]

---

৭০. বুখারী, হাদীস নং ৮৭৯, মুসলিম, হাদীস নং ১৯২০, আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৪১

[৭১] . وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم الحديث-٣٥٣، عن عكرمة و سكت عنه البخاري.

৭১. আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৫৩।

[৭২] . أبو داود ، كتاب الطهارة، باب التشهد في ذلك، رقم الحديث-١٩٤.

والنسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء ما غيرت النارْ رقم الحديث-١٧١، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

৭২. আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৪, নাসাঈ, হাদীস নং ১৭১।

[৭৩] . الترمذي، كتاب الأطعمة، باب في التسمية في الطعام حديث-١٨٤٨، عن عكراش رضي الله عنه.

তৃতীয় কারণ

ভুল-ত্রুটি হওয়া

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সাহাবাগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁদেরকে দোষযুক্ত বা দূর্বল বলার সুযোগ নেই। সুতরাং ইসাবা নামক কিতাবে এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের ঐক্যমতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্বসত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি মানবিয় আবশ্যক বিষয়। যা সবার ক্ষেত্রেই হতে পারে। এ জন্য বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি হওয়াও সম্ভব। তাই বর্ণনার উপর আমল কারীর জন্য এটাও খুব জরুরী যে, সেই বর্ণনাকে এ ধরণের অন্যান্য বর্ণনার সাথে মিলিয়ে দেখবে যে, ইহার বিপরীত কোন বর্ণনা আছে কি না ? যদি বিপরীত কোন বর্ণনা থাকে তাহলে বৈপরীত্যের কারণ তালাশ করতে হবে।

এ প্রকারের অসংখ্য উদাহরণ হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়। যেমনঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাসে উমারাহ আদায় করেছেন। হযরত আয়েশা রা. যখন এ কথা শুনলেন তখন বললেন যে, ইবনে উমার ভুলে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাসে কোন উমরাহ করেন নি।[৭৪] হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. এর বাণী যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে তিনি বলেছেন আল্লাহর শপথ আমার এতো হাদীস মুখস্ত আছে যে, আমি দুইদিন পর্যন্ত ধারাবাহীক ভাবে হাদীস বর্ণনা করতে পারবো। কিন্তু বাঁধা হল যে, আমার ন্যায় অন্যান্য সাহাবাগণ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনেছেন ও তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। এর পরও বর্ণনা

---

৭৩. তিরমিযি,হাদীস নং ১৮৪৮।

[৭৪]. البخاري، كتاب العمرة، باب كم اعتمر صلي الله عليه وسلم، رقم الحديث-١٧٧٦.
ومسلم، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي صلي الله عليه وسلم وزمانهن، رقم الحديث-١٢٥٥.
والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في عمرة رجب، رقم الحديث-٢٩٩٨، كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن عائشة رضي الله عنه.

৭৪. বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৬, মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৫, তিরমিযী, হাদীস নং২৯৯৮

করতে তাঁরা ভুল করতেন। তবে পার্থক্য এই যে, তাঁরা বুঝে-শুনে মিথ্যা বলতেন না। যদি আমিও বর্ণনা করি তাহলে আমার ভয় হয় যে, যদি আমিও তাঁদের দলভুক্ত হয়ে যাই কি না। হযরত আলী রা. হযরত আবু বকর রা. ছাড়া অন্য কারো থেকে হাদীস শুনলে তাকে এ বলে শপথ করাতেন যে, বাস্তবেই সে এরূপ শুনেছেন কি-না? এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাদীস অনুযায়ী আমল করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ পযন্ত তার এ যোগ্যতা না হবে যে সহীহকে দূর্বল, সঠিককে ভুল, বাস্তবকে অবাস্তব থেকে পৃথক করতে পারবে। (যে কেউ কোন হাদীস শুনলেই যে তার উপর আমল করবে এমনটি নয় বরং যাচাই বাছাই ও তাহকীক করার পর আমল করবে)

বর্ণনার ভিন্নতার কারণসমূহের মধ্যে উপরোক্ত কারণের কাছাকাছি আরেকটি কারণ হলো আয়ত্ব করার ভিন্নতা অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণ ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি করে ফেলেছে। এটা অসম্ভব কোন বিষয়ও নয় যে, কখনো কখনো বড় থেকে বড় বুঝমান, বিবেকবান ব্যক্তি থেকেও কথা বুঝা, বর্ণনা করা ও ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়া। সুতরাং আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বর্ণনা করেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের কান্না-কাটি করার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।[৭৫] হযরত আয়েশা রা. উক্ত হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা দোষ নির্ণয় করে বলেন, ঘটনা

---

[৭৫]. البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي صلي الله عليه و سلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، رقم الحديث-١٢٨٧،

مسلم: كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم الحديث- ٢١٤٣،

والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية البكاء علي الميت، رقم الحديث- ١٠٠٢،

والنسائي: كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء علي الميت، رقم الحديث- ١٨٤٩،

وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، رقم الحديث- ١٥٩٣،

كلهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح.

৭৫. বুখারী, হাদীস-১২৮৭, মুসলিম, হাদীস-২১৪৩, তিরমিযী,হাদীস-১০০২, নাসায়ী, হাদীস-১৮৪৯, ইবনে মাজাহ, হাদীস-১৫৯৩।

বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। বাস্তব ঘটনা ছিলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক ইয়াহুদী মহিলার লাশের কাছ দিয়ে গেলেন আর তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্না-কাটি করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এসকল লোক কান্না-কাটি করছে অথচ তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।[৭৬] সুতরাং হযরত আয়েশা রা. এর মতে তাকে কবরে শাস্তি দেওয়ার কোন কারণ তাদের ক্রন্দন ছিলো না।

এমনিভাবে হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, যদি গোছলের প্রয়োজন থাকাবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে যায় তাহলে সেদিন রোজা রাখতে পারবে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও এটা বর্ণনা করেন ও স্বয়ং তারই ফাতওয়া এর উপরই ছিল। সুতরাং 'ফাতহুল বারী' নামক কিতাবের রোজার অধ্যায়ে এসম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনাগুলো একত্রিত করা হয়েছে।[৭৭] পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা ও হযরত উম্মে সালমা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোসলের প্রয়োজন হতো এমন অবস্থায়ও তিনি দিনের রোজা রাখতেন।[৭৮]

---

[٧٦] . البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي صلي الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، رقم الحديث- ١٢٨٩،

مسلم: كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم الحديث- ٢١٢٣،

والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء علي الميت، رقم الحديث- ١٠٠٢،

والنسائي: كتاب الجنائز، باب النياحة علي الميت، رقم الحديث- ١٨٥٧،

وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، رقم الحديث-١٥٩٥،

عن عائشة رضي الله عنها.

৭৬. বুখারী, হাদীস নং-১২৮৯, মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৬, তিরমিযী, হাদীস নং ১০০৬, নাসায়ী, হাদীস নং-১৮৫৭, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫৯৫।

[٧٧] . فتح الباري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا.

৭৭. ফাতহুল বারী কিতাবুস সওম।

[٧٨] . البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا، رقم الحديث-١٩٢٥، عن عائشة و أم سلمة رضي الله عنهما.

এক জামাত বর্ণনা করেন যে, নামাযীর সামনে দিয়ে যদি কোন মহিলা বা কোন কুকুর যায় তাহলে নামায ভেঙ্গে যায়।[৭৯] হযরত আয়েশা রা. এটা অস্বীকার করেন ও বলেন যে, এটা সঠিক না।[৮০]

হযরত ফাতেমা বিনতে কাইস রা. বর্ণনা যে, তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার ভরণ-পোষণ, বাসস্থানের ব্যায় ভার স্বামীর উপর বর্তাবে না। এ কথা যখন হযরত উমার রা. এর কাছে পৌঁছল তখন তিনি বললেন যে, আমি একজন মহিলার কথায় কোরআনের হুকুম ছাড়তে পারি না। (কুরআন ভরণ পোষণ দেওয়ার কথা বলেছে।)[৮১]

মোটকথা এই যে, এধরনের আরো অনেক হাদীস পাওয়া যাবে যেগুলোর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের থেকে ভুল হয়েছে। এ জন্যই খবরে ওহেদ (এককভাবে বর্ণিত হাদীস) এর উপর আমল করার জন্য উলামাগণ অনেক মূলনীতি সাব্যস্ত করেছেন। যাতে করে সেগুলো দ্বারা বর্ণনা যাচাই করে নিতে পারে। যদি মূলনীতি অনুযায়ী হয় তাহলে আমল করবে অন্যথায় নয়। হযরত উমার রা. এর উক্ত ঘটনার মাধ্যমে হানাফী উলামাগণের ওই মূলনীতি দৃঢ় হয় যে, তাঁরা সর্বদা ওই হাদীসকে প্রাধান্য দেয় যা কুরআনী বিষয় বস্তু অনুযায়ী হয়।

---

৭৮. বুখারী, হাদীস নং ১৯২৫।

[৭৯]. مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، رقم الحديث- ١١٣٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، رقم الحديث-٧٠٢، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء انه لا يقطع الصلاة إلا الكلب و الحمار و المرأة، رقم الحديث-٣٣٨، عن أبي ذر رضي الله عنه، و قال حسن صحيح.

৭৯. মুসলিম, হাদীস নং-১১৩৯, আবূ দাউদ, , হাদীস নং ৭০২, তিরমিযি, , হাদীস নং ৩৩৮

[৮০]. مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم الحديث-١١٤٢، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال المرأة، لا تقطع الصلاة، رقم الحديث-٧١١,٧١٢، النسائي، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، رقم الحديث-٧٥٦١، عن عائشة رضي الله عنها.

৮০. মুসলিম, হাদীস নং ১১৪২, আবূ দাউদ, হাদীস নং ৭১১, ৭১২, নাসাঈ, হাদীস নং ৭৫৬।

[৮১]. أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار، رقم الحديث-٣٧١٠، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

৮১. আবূ দাউদ, , হাদীস নং ৩৭১০।

যদিও বিপক্ষের হাদীসের বর্ণনাকারী পক্ষের হাদীসের বর্ণনাকারীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য অথবা সংখ্যাগত দিক দিয়ে বেশী হয়। আর উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা এ কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, হাদীস অনুযায়ী আমল করা ওই ব্যক্তির কাজ যে, (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) ভুল বুঝতে পারে। আফসোসের বিষয় এই যে, স্বর্ণ ক্রয়কারী পরীক্ষা করার জন্য স্বর্ণকারের মুক্ষাপেক্ষি। অথচ হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য কোন যাচাই-বাছাই কারীর প্রয়োজন মনে করা হয় না। এ ক্ষেত্রে কোন অবগতি ছাড়াই নিজ জ্ঞানের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে থাকে। আল্লাহ তা'আলাই সাহায্য করুন।

চতুর্থ কারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন ইরশাদ কে তার বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা।

সাহাবাগণ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাকীকী আন্তরিক ও বাস্তবিক আশেক ছিলেন যাদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি কাজের উপর পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ হতেন।

সাহাবাগণ সম্পর্কের উদাহরণ ও বর্ণনাতীত। তবে ছোট থেকে ছোট একটি উদাহরণ হলো হযরত আনাছ রা. বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন কোন এক সাহাবীর নির্মানাধীন বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (যে বাড়ির একটি কামড়াও তৈরী হয়ে গিয়েছিলো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটা কার ? মালিক সম্পর্কে জানার পর মুখে কিছু বললেন না। পরবর্তীতে যখন ঘরের মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের উত্তর দিলেন না। তিন বার এরুপ করার পর তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ও জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটা কার বাড়ী ? এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষনাত যেয়ে উক্ত কামরাসহ বাড়ীর সবকিছু ভেঙ্গে ফেললেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে

যেয়ে বাড়ী ভেঙ্গে ফেলারও সংবাদ পর্যন্ত দিলেন না লজ্জা ও অপমানের কারণে। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় বার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বিষয়টি জানতে পারলেন।[৮২] মোটকথা তাঁরা কখনো কখনো মাহবূবের যবান থেকে নিসৃঃত শব্দের বাহ্যিক অনুযায়ী আমল করতেন। আর এটারও সম্ভাবনা আছে যে, কোন কোন সাহাবী উদ্দেশ্য ঐটাই বুঝতেন যার উপর তিনি আমল করতেন। কিন্তু এটাও অসম্ভব নয়, বরং কিছু কিছু শব্দ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, স্বয়ং তাঁরা ও কখনো কখনো বুঝতে পারতেন যে, ইহা বাস্তব উদ্দেশ্য নয়। তারপর বাহ্যিক শব্দে যা আছে তার উপরই আমল করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর এক দরজার দিকে ইশারা করে বললেন যে, 'আমি এই দরজাকে মহিলাদের জন্য খাস করে দিলে ভালো হতো' এর পর থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. কখনো সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন নি।[৮৩]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. এর ইন্তেকালের সময় তিনি নতুন কাপড় আনিয়ে পরিধান করলেন আর বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, মানুষ যে কাপড়ে মৃত্যু বরণ করবে তাকে সেই কাপড়েই হাশরের ময়দানে উঠানো হবে।[৮৪]

কুরআন শরীফের এই আয়াত ' كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ' এর তাফসীরে প্রসিদ্ধ বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষকে হাশরে বিবস্ত্র অবস্থায়

---

[৮২]. أبو داود، كتاب الأدب، باب في البناء،رقم الحديث-٥٢٣٧، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وسكت عنه المنذري.

৮২. আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২৩৭।

[৮৩]. أبو داود، كتاب الصلاة، باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، رقم الحديث-٤٦٢، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسكت عنه المنذري.

৮৩. আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬২।

[৮৪]. أبو داود، كتاب الجنائز' باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، رقم الحديث-٣١١٤، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسكت عنه المنذري.

৮৪. আবূ দাউদ কিতাবুল জানায়েয হাদীস নং ৩১১৪।

উঠানো হবে।[৮৫] বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা উক্ত বিষয় প্রমাণিত। আর এটা অসম্ভব যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। (অর্থাৎ এ হাদীসের বাস্তব উদ্দেশ্য তিনি অবশ্যই বুঝেছেন) কিন্তু এরপরও তিনি শুধু হাদীসের বাহ্যিক শব্দ অনুযায়ী আমল করার জন্য নুতন কাপড়ে এ কাজ করেছেন।

এ ধরণের উদাহরণ অনেক হাদীসে পাওয়া যায়, যদিও বাহ্যত এটা অসম্ভব মনে হয় কিন্তু যারা ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে গেছে তারা বুঝতে পারবে যে, ভালোবাসার শব্দ সমূহ কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়াই কি পরিমান সুস্বাদু! এ কারণেই সাহাবাগণ রহিত বর্ণনা সমূহ বর্ণনা করতেন অথচ কোন রহিত হুকুম বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন থাকে না। এমনিভাবে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করা হয় যেগুলো স্পষ্টভাবেই রহিত।

হাদীস অন্বেষণকারীদের আদব

ইলমে হাদীস নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা এবং সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা, বর্ণনা বা লেখালেখি করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীন এর চেয়েও বেশী শক্ত সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। যদিও অনিচ্ছাকৃতভাবে বিষয়বস্তু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তবে যুগের দাবি পূরণ করতে গিয়ে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) এর একটা অতি আশ্চর্য ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। যা দ্বারা আন্দাজ করা যাবে যে, ইল্‌মে হাদীস হাসিল করার জন্য এবং তার তালেব হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কি পরিমাণ কঠিন মেহনতের কথা বলেছেন। মুহাদ্দিস ও শায়খুল হাদীস হওয়া তো আরো অনেক পরের কথা।

---

[৮৫]. البخاري، كتاب التفسير، باب كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ، رقم الحديث-٤٧٤١،
ومسلم، كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم الحديث-٧٢٠١،
والترمذي، كتاب صفة القيامة، باب في شأن الحشر، رقم الحديث-٢٤٢٣،
والنسائي، كتاب الجنائز، باب في البعث، رقم الحديث-٢٠٨٤، كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما،
وقال الترمذي: حسن صحيح.

৮৫. বুখারী, হাদীস নং ৪৭৪০, মুসলিম, হাদীস নং ৭২০১, তিরমিযি, হাদীস নং ২৪২৩ নাসাঈ, হাদীস নং ২০৮৪।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (রহ.) বলেন, হযরত ওলীদ ইবনে ইবরাহীম (রহ.) 'রিই'ই' নামক স্থান থেকে বিচারকের পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যখন বুখারায় আসলেন তখন আমার উস্তাদ হযরত আবু ইবরাহীম খাত্তালী আমাকে সহ তাঁর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, যে সমস্ত হাদীস আপনি আমাদের মাশায়েখ ও উস্তাদগণ থেকে শুনেছেন তা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, হাদীসের বর্ণনা তো আমি শুনি নি। আমার উস্তাদ খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এতবড় ফক্বীহ ও অভিজ্ঞ আলেম হওয়ার পরও এমন কথা বললেন? উত্তরে তিনি তাঁর এক কাহিনী শুনালেন। তিনি বলেন, বালেগ হওয়ার পর হাদীস পড়ার আমার খুব আগ্রহ হল। তখন আমি হযরত ইমাম বোখারী রহ. এর খেদমতে হাজির হয়ে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি আমাকে আদরের সাথে বললেন, বৎস! তুমি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করবে তখন সর্বপ্রথম ঐ কাজের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিবে। এরপর তার সীমারেখা ও নিয়ম কানূন জানার পর ঐ কাজ শুরু করবে।

এখন শুন! কোন মানুষ ঐ পর্যন্ত কামেল মুহাদ্দেস হতে পারবে না যতক্ষণ না সে (১) চারটি জিনিসকে অন্য চারটি জিনিসের সাথে এমনভাবে লিখবে যেমন চারটি জিনিস অন্য চারটি জিনিসের সাথে (২) চারটি জিনিস চারটি জামানার মধ্যে (৩) চারটি অবস্থার সাথে চার স্থানে (৪) চারটি জিনিসের উপর চার প্রকার মানুষ থেকে।

আর তা চার উদ্দেশ্যের জন্য হবে। আর এই চার বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না যতক্ষণ না এমন চারটি জিনিস হাসিল করা হবে যা অন্য চারটি জিনিসের সাথে হবে। এসব জিনিস যখন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন তার জন্য চারটি জিনিস সহজ হয়ে যাবে এবং চারটি বিপদে সে লিপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলোর উপর সবর করলে আল্লাহ পাক তাঁকে চারটি জিনিস দ্বারা দুনিয়াতে সম্মানিত করবেন এবং চারটি পুরস্কার পরকালে দান করবেন।

তখন আমি বললাম, হযরত! আল্লাহ পাক আপনার উপর রহম করুন। এবার এই চারটি বিষয়ের একটু ব্যাখ্যা করে বলুন। তিনি বললেন, শুন! ঐ চারটি জিনিস যা লেখার প্রয়োজন হয় তা হল,

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত হাদীস ও তাঁর আদেশ নিষেধ লেখা।

(২) সাহাবাগণের বাণী ও তাঁদের ইলমী মর্যাদা অর্থাৎ কোন সাহাবী কোন্ স্তরের ছিলেন তা লেখা।

(৩) তাবেঈনগণের বাণী ও তাঁদের ব্যক্তিমর্যাদা অর্থাৎ কে নির্ভরযোগ্য আর কে নির্ভরযোগ্য নয় তা লেখা।

(৪) হাদীস বর্ণনাকারী সকলের জীবনী ও তাঁদের জন্ম তারিখ লেখা।

চারটি জিনিস লিখতে হয় চারটি জিনিসের সাথে তা হল (১) হাদীস বর্ণনাকারীর নাম (২) তাঁদের উপনাম (৩) তাঁদের বাসস্থান (৪) তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ। যার দ্বারা এটা বুঝা যাবে যে, তাঁরা যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে কি না। এগুলো এমন জরুরী বিষয় যেমন বক্তৃতার জন্য হামদ ও সানা হওয়া জরুরী এবং রাসূলগণের প্রতি দুরুদ শরীফ পড়া এবং সূরার সাথে বিসমিল্লাহ পড়া ও নামাযের শুরুতে তাকবীর বলা জরুরী।

আর চারটি জিনিস চার জামানায় লেখা দ্বারা উদ্দেশ্য হল (১) মুছনাদ (২) মুরছাল (৩) মাওকূফ (৪) মাক্বতু। এসব ইল্মে হাদীসের চার প্রকারের নাম।

চার জামানার মধ্যে লেখা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, (১) বাল্যকালে (২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে (৩) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে (৪) বার্ধক্যের পূর্ব পর্যন্ত।

চার অবস্থার অর্থ হল (১) কর্ম ব্যস্ততার সময় (২) কর্ম মুক্ততার সময় (৩) দরিদ্রতার সময় (৪) ধনাঢ্যের সময়। মোটকথা সবসময় এরই মধ্যে লেগে থাকবে।

চার জায়গার উদ্দেশ্য হল (১) পাহাড়ের উপর (২) নদীর মধ্যে (৩) শহরে (৪) জঙ্গলে। মোটকথা হাদীসের উস্তাদ যে স্থানেই পাওয়া যায় সেথায় হাদীস হাসিল করা।

চারটি জিনিসের উপরের অর্থ হল (১) পাথরের উপর (২) ঝিনুকের উপর (৩) চামড়ার উপর (৪) হাড়ের উপর। মোটকথা কাগজ বা এ জাতীয় লেখার উপযোগী কোন কিছু পাওয়ার আগ পর্যন্ত এসকল জিনিসের

উপর লিখতে হবে। যাতে করে হাদীসসমূহ মেধা থেকে হারিয়ে যেতে না পারে।

চারজন থেকে হাসিল করবে তা হল, (১) নিজের চেয়ে বড় থেকে (২) নিজের চেয়ে ছোট থেকে (৩) নিজের সমসাময়িকদের থেকে (৪) আপন পিতার কিতাব থেকে যদি তাঁর লেখা বুঝা সম্ভব হয়। মোটকথা ইল্‌ম হাসিল করতে অলসতা করবে না। নিজের সমসাময়িক ও ছোটদের থেকেও ইলম হাসিল করতে লজ্জাবোধ করবে না।

চারটি উদ্দেশ্যের জন্য তা হল, (১) আল্লাহ পাককে রাজিখুশী করার জন্য। কারণ মনিবের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা গোলামের জন্য ফরজ (২) কোরআন পাকের অনূকুলে যত বিষয় আছে তার উপর আমল করার জন্য (৩) আগ্রহী তালেবদের কাছে পৌছানোর জন্য (৪) ইল্‌ম কিতাবাকারে লেখার জন্য যাতে করে পরবর্তী প্রজন্মদের জন্য তাতে হেদায়েতের ধারা চালু থাকে।

উল্লেখিত জিনিসগুলো হাসিল করতে হলে এর পূর্বে আরো চারটি জিনিস অবশ্যই হাসিল করতে হবে। আর এগুলো মানুষের আওতাধীন জিনিস। কষ্ট মেহনত করে যা অর্জন করতে হয়। (১) ইলমে কেতাবাত অর্থাৎ লেখার যোগ্যতা অর্জন করা (২) ইল্‌মে লোগাত যার দ্বারা শব্দের আভিধানিক সঠিক অর্থ বুঝা যাবে। (৩) ইলমে সরফ বাক্যের গঠন প্রণালী বুঝা যায় (৪) ইলমে নাহু যেগুলো দ্বারা শব্দের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা বুঝা যাবে।

এই বিদ্যাগুলো আবার এমন চারটি জিনিসের উপর নির্ভর করে যেগুলো পুরোপুরি ভাবে আল্লাহ পাকের দান। বান্দার চেষ্টা মেহনতের উপর তা নির্ভরশীল নয়। আর তা হল (১) সুস্থতা (২) শক্তি (৩) শিক্ষার প্রতি আগ্রহ (৪) স্মরণশক্তি।

এসব জিনিস যখন মানুষের হাসিল হয় তখন ইল্‌ম হাসিল করতে চারটি জিনিসের গুরুত্ব তার কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়। অর্থাৎ (১) পরিবার (২) সন্তান (৩) অর্থ-সম্পদ (৪) ঘর-বাড়ী।

এরপর চারটি বিপদে সে লিপ্ত হয়ে যায় (১) বিপদের সময় দুশমনদের পক্ষ থেকে আনন্দের হাসা-হাসি (২) দোস্তদের পক্ষ থেকে তিরস্কার ও

নিন্দাবাদ (৩) মূর্খ ও জাহেল লোকদের পক্ষ থেকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ (৪) ওলামাগণের পক্ষ থেকে হিংসা ও জ্বলন-পোড়ন এবং শত্রুতা ও অনিষ্ট কামনা।

পরে মানুষ যখন এগুলোর উপর সবর করে তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে চারটি জিনিস দুনিয়ায় দান করেন, আর চারটি জিনিস আখেরাতে দান করেন। দুনিয়ায় যে চারটি জিনিস দান করেন তা হল, (১) অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং সম্মানিত হওয়া (২) পূর্ণ একীনের সাথে গাম্ভীর্যতা ও মাহাত্ম্য (৩) ইল্মের স্বাদ ও মজা (৪) দায়েমী যিন্দেগী।

আর পরকালে যে চারটি জিনিস দান করেন তা হল, (১) শাফায়াতের অধিকার, যার জন্যই তিনি চাইবেন তার জন্য শাফায়াত করতে পারবেন (২) আরশের নীচে ছায়া, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না (৩) হাউজে কাওসারের অধিকার, অর্থাৎ যার জন্য তিনি চাইবেন তাকে হাউজে কাওসার থেকে পান করাতে পারবেন (৪) আম্বিয়াগণের সাথে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান পাওয়া।

সুতরাং হে বৎস! আমি আমার উস্তাদ ও পীর মাশায়েখগণের থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যা কিছু শুনেছিলাম তার সবই সংক্ষিপ্তভাবে তোমাকে বলে দিলাম। এবার তোমার জন্য স্বাধীনতা রয়েছে যে, ইচ্ছা হলে তুমি হাদীসশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে পারো আর না চাইলে না করতে পারো।[৮৬]

উপরোক্ত এই উসূল ও মূলনীতিগুলো ইমাম বুখারী রহ. ওই সমস্ত ব্যক্তির জন্য একত্রিত করেছেন যে মুহাদ্দিস বা হাদীসের আলেম হওয়ার ইচ্ছা পোষন করে। আমাদের জন্য বাস্তবিক অর্থে-ই ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত নসীহত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ও মজবুত ভাবে তা আকড়ে ধরা উচিত। বাস্তবে তো ইলমে হাদীস এর চেয়েও বেশী কঠিন। আর বর্তমান অলসতার যুগে যেখানে মানুষের ইলম অর্জনের শেষ সীমা মনে করা হয় সিহাহ সিত্তার কয়েকটি কিতাব যেগুলো পড়ে নিজেকে মুহাদ্দিস বা

---

[৮৬] . تدريب الراوي، النوع الثامن و العشرون،معرفة طالب الحديث و تهذيب الكمال-٦/٢٣٦

৮৬. তাদরীবুর রাবী, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-৬/২৩৬

ইলমে হাদীসের ফাযেল মনে করতে থাকে। বাস্তবে মুর্খতার এই যুগে আমাদের মতো অর্ধ মৌলভীদের দ্বারা ইলমে দ্বীনের যে, পরিমান ক্ষতি হচ্ছে এর উদাহরণ সম্ভবত তালাশ করলে পূর্বের কোন যুগে তা পাওয়া যাবে না। যার অনেক কারণ হতে একটি কারণ হলো নিজ ফযীলতের উপর আস্থা, নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রতি ভরসা অথচ মূতাআখখিরীন ফকীহগণ নিজ রায় অনুযায়ী ফাতওয়া দেওয়াকেও এই যুগে অনুমতি দেন নি বরং উহার সাদৃশ্য পূর্বের কোন ফাতওয়া থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মাসআলা মাসায়েল তো অনেক দূরের বিষয় বড় বড় ইলমি তাহকীক নিজ যোগ্যতা, নিজ বুঝ অনুযায়ী হয়ে থাকে

মোটকথা এই আলোচ্য বিষয় নিজ প্রয়োজন থাকা স্বত্তেও মূল আলোচ্য বিষয় থেকে বহির্ভূত রেখে আমি পূর্বের আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি। অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দিতে বর্ণনার ভিন্নতার অনেক কারণ থেকে উদাহরণ হিসেবে উপরোক্ত চারটি কারণের উপর ক্ষান্ত করছি। সামনে এগুলো অর্থাৎ এর পর সাহাবী, তাবে তাবেয়ী, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন। মোট কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে যতই দূর হয়েছে ততই বর্ণনার ভিন্নতার কারণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বৃদ্ধি আবশ্যক ও ছিল। কেননা যত মুখ তত কথা। উক্ত কারণ বাস্তবে অনেক কারণের সমষ্টি সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে সবগুলোকে একটির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে বর্তমানের পঞ্চম কারণ সাব্যস্ত করেছি যাতে আলোচ্য বিষয় দীর্ঘায়িত না হয়।

পঞ্চম কারণ

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মাধ্যম অনেক হওয়া

হাদীস সমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে যত বেশী মাধ্যম হবে পূর্ববর্তী সকল কারণের ভিত্তিতে ততবেশী ভিন্নতা তৈরী হবে। আর এমনটি হওয়া আবশ্যক। সকলের সামনেই আসে সকলেই বুঝে যে, কোন দূতের মাধ্যমে কোন একটি কথা বলে পাঠালে যদি তাতে কয়েক মাধ্যম এসে যায় তাহলে তাতে ভিন্নতা আসা আবশ্যক। এ জন্য হাদীসের ইমামগণ বর্ণনা সমূহ

থেকে কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হিসেবে উঁচু সনদ অর্থাৎ মাধ্যম কম হওয়া কে একটি বড় কারণ সাব্যস্ত করেছেন। যদি আল্লাহ তা'আলা কখনো সুযোগ দেন তাহলে তা যথাস্থানে পরবর্তীতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবো। এখানে শুধু সংক্ষিপ্ত আকারে এতটুকু ইশারা করা জরুরী যে, যুক্তিগত, বর্ণনাগত, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষভাবে বুঝা যায় যে, মাধ্যম অধিক হওয়া ভিন্নতার অন্যতম একটি কারণ। আর এটাই বর্ণনার ভিন্নতার বড় একটা কারণ। হানাফীদের মতে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ফেকাহকে অন্যান্য ইমামগনের (ফকীহ ও মুহাদ্দিস) বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অন্যান্য অনেক কারণ থেকে এটাও একটি কারণ। কেননা ইমাম আবূ হানীফা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে মাধ্যম খুব কম। স্পষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রসিদ্ধ ইমামগনের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ছক আকারে দেওয়া হলো ঃ

নাম	জন্ম	ইন্তেকাল	মোট বয়স
ইমাম আবূ হানীফা রহ.	৮০ হিঃ	১৫০ হিঃ	৭০ বছর
ইমাম মালেক রহ.	৯৫ হিঃ	১৭৯ হিঃ	৮৪ বছর
ইমাম শাফেয়ী রহ.	১৫০ হিঃ	২০৪ হিঃ	৫৪ বছর
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.	১৬৪ হিঃ	২৪১ হিঃ	৭৭ বছর
ইমাম বুখারী রহ.	১৯৪ হিঃ	২৫৬ হিঃ	৬২ বছর
ইমাম মুসলিম রহ.	২০৪ হিঃ	২৬১ হিঃ	৫৭ বছর
ইমাম আবূ দাউদ রহ.	২০২ হিঃ	২৭৬ হিঃ	৭৪ বছর
ইমাম তিরমিযি রহ.	২০৯ হিঃ	২৭৯ হিঃ	৭০ বছর
ইমাম নাসাঈ রহ.	২১৪ হিঃ	৩০৩ হিঃ	৮৯ বছর
ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.	২০৯ হিঃ	২৭৩ হিঃ	৬৪ বছর

উক্ত ছক দ্বারা একথা খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর পর্যন্ত বর্ণনা আসতে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ হতে প্রায় ২০০ (দুইশত) বছর আতিবাহিত হয়ে গেছে সেহেতু অনেক মাধ্যম এসেগেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক রহঃ এর বিপরীত। কেননা এ ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) বছরের ও ব্যবধান হয় নি। মোটকথা মাধ্যম অধিক হওয়া বর্ণনার ভিন্নতার কারণ হয়ে থাকে। আর হাদীসের কিতাব সংকলন যেহেতু ব্যপকভাবে দ্বিতীয় শতাব্দি থেকে শুরু হয়েছে সেহেতু সে সময় পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের অধিক মাধ্যম হওয়ায় বর্ণনার শব্দে অনেক ভিন্নতা এসে গেছে।

ষষ্ঠ কারণ

সনদে কোন এক বর্ণনাকারী দূর্বল হওয়া

মাধ্যম অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন দূর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী এসে যায়। কোন দূর্বল মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি অথবা অন্য কোন প্রাসঙ্গিক কারণে যে কোন কিছু বর্ণনা করে দেয়। তাদের মধ্যে কতক এমন বর্ণনাকারী ছিলেন যে, যারা নিজ মেধাশক্তি অথবা কিতাবের উপর আস্থা রাখতো কিন্তু তাদের মাঝে কোন দূর্ঘটানায় এমন কিছু ঘঠেছে, যার কারণে তারা বর্ণনার ক্ষেত্রে গন্ডগোল করে ফেলেছে। ভুল বর্ণনা করছে। এ জন্য মুহাদ্দিসগণ হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য প্রত্যেক বর্ণনাকারী সম্পর্কে অবগত হওয়াকে খুবই জরুরী মনে করেন। আর এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ সাধারণ ব্যক্তির জন্য হাদীস শুনেই সে অনুযায়ী আমল করতে নিষেধ করেছেন। শরহে আরবাঈনে নববীয়্যাহ তে আছে

'অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুনানের কিতাবে থাকা কোন হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করতে চায় যেমন, আবূ দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ ইত্যাদি বিশেষ করে ইবনে মাজাহ, মুসান্নেফ ইবনে আবী শায়বা, মুসান্নেফ আব্দুর রাজ্জাক ও এ ধরনের ওই সকল কিতাব যেগুলোতে দূর্বল বর্ণনা অধিক পরিমানে রয়েছে। সে যদি আহ্‌ল অর্থাৎ সহীহ হাদীসকে গায়রে সহীহ হাদীস থেকে পৃথক করতে পারে এরপরও তার জন্য ওই সময় পর্যন্ত কোন হাদীসকে দলীল

বানিয়ে নেওয়া জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এর সনদের তাহকীক ও বর্ণনাকারীদের অবস্থা যাচাই না করবে। আর যদি সে এ তাহকীকের উপযুক্ত না হয় তাহলে কোন ইমামের অনুস্বরন করা জরুরী। অন্যথায় তার জন্য দলীল দেওয়া জায়েয হবে না। যাতে সে কোন বাতেল পথে না পড়ে যায়।'

এই বিষয়বস্তু আমরা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে দিবো যে, সংখ্যাগরিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস এব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তির বর্ণনার শুদ্ধতা ও দূর্বলতা জানার যোগ্যতা নেই, রহিত ও রহিত না এ পার্থক্য করতে পারেনা ব্যাপক হুকুমকে খাছ হুকুম থেকে পৃথক করতে পারে না। তার জন্য হাদীস অনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই। বাস্তবে এই বিষয়টি কোন ব্যাখ্যার কোন মুখাপেক্ষী নয়। এটা এতো স্পষ্ট বিষয় যে, যে ব্যক্তি সহীহকে দূর্বল থেকে পৃথক করতে সক্ষম নয় সে কিভাবে সে অনুযায়ী আমল করবে।

সপ্তম কারণ

মিথ্যার ব্যপকতা হওয়া

খায়রুল কুরুন অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী মিথ্যার প্রকাশ হয়েছে।[৮৭] লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা শুরু করে দিয়েছে। এজন্য মুহাদ্দিস উলামাগণ মাওযু হাদীসের একাধিক কিতাব লিখেছেন। সেই মিথ্যাবাদীদের মধ্য থেকে এমন কিছু লোকও ছিলো যারা নিজেদের উদ্দেশ্য প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে মনগড়া হাদীস বানিয়ে দিয়েছে। এটা এমন একটি কারণ যদ্বারা যতই বর্ণনার ভিন্নতা হোক না কেন তা কম-ই মনে হবে।

ইবনে লাহাইয়া এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেন যে, কোন এক সময় খারেজীদের শায়েখ ছিলো পরবর্তীতে তার তওবা করার সুযোগ হয়েছিলো তখন তিনি নিম্মোক্ত এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, হাদীস অর্জন করার

---

[৮৭] . الترمذي، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة، رقم الحديث-٢١٦٥، عن أبن عمر رضي الله عنهما، وقال: حسن صحيح غريب عن هذا الوجه. وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن يستشهد، رقم الحديث-٢٣٦٣، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.

৮৭. তিরমিযি, হাদীস নং-২১৬৫, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ২৩৬৩

সময় এর বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যাচাই করুন। কেননা আমরা যখন কোন কথা প্রচারের ইচ্ছা করতাম তখন তাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিতাম। হাম্মাদ বিন সালামাহ রহ. এক রাফেযীর কথা বর্ণনা করেন যে, আমরা আমাদের বিভিন্ন মজলিসে যখন কোন বিষয় নির্ধারন করতাম তখন সেটাকে আমরা হাদীস বানিয়ে নিতাম। মাসীহ ইবনে জাহাম এক বেদআতীর কথা বর্ণনা করেন যে, যখন সে তওবা করে তখন সে কসম খেয়ে বলে আমরা অনেক বাতেল বর্ণনা তোমাদের থেকে বর্ণনা করি আর তোমাদের গোমরাহ করাকে আমরা সওয়াবের কাজ মনে করি ইত্যাদি ইত্যাদি। হাদীসের হাফেযগন উক্ত বর্ণনাগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে হাফেয রহ. "লিছান" নামক কিতাবের শুরুতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৮৮]

উক্ত আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা। কেননা স্বয়ং নিজেরা স্বীকার করেছে যে, আমরা মনগড়া হাদীস বানিয়েছি। আর এই কারণটা অনেক কারণের সমষ্টি। কতক লোক তো নিজেদের ওই উদ্দেশ্যের জন্য বানাতো যেগুলোকে তারা দ্বীন মনে করতো। যেমন, রাফেযী, খারেজী ইত্যাদি ইত্যাদি। যাদের কথা পূর্বে বলা হল। এ জন্য মুহাদ্দিসগণ হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য নির্ধারিত নীতিমালা ও অন্যান্য শর্ত নির্ধারণ করেছেন। যেমন যে ব্যক্তি সম্পর্কে রাফেযী থাকার কথা জানা যাবে সে ব্যক্তি বর্ণিত আহলে বাইতের ফাযায়েল সম্পর্কিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত হাম্মাদ বিন যায়েদ রহ. বলেন যিনদীকরা চৌদ্দ হাজার হাদীস বানিয়েছে। যাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নাম হলো আব্দুল কারীম ইবনে আবিল আওজা তাকে মাহদীর যুগে শুলীতে চড়ানো হয়েছিলো। যখন তাকে শুলিতে চড়ানো হচ্ছিলো তখন সে বললো "আমি হাজার হাজার মনগড়া হাদীস বানিয়েছি তম্মধ্যে হালাল বস্তুকে হারাম ও হারাম বস্তুকে হালাল বানিয়েছি"। আবার কতক ছিলো যারা কোন আমীর ও বাদশাহর মন খুশির জন্য মনগড়া হাদীস বানিয়ে দিতো। যাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে

---

[৮৮]. لسان الميزان-١/١١.

৮৮. লিসানুল মীযান ১/১১।

মাওযু'আতে উল্লেখ আছে। আর যে সম্পর্কে হাদীসের ইমামগণ বেশী আলোচনা করেছেন সে প্রকারের মধ্যে হলো সূফী ও ওয়ায়েজদের বর্ণনা সম্পর্কে। কেননা সূফীগণ মানুষের প্রতি ভালো ধারণার কারণে সকলের কথার উপর নির্ভর করেন ও তা সত্য মনে করে অন্যদের কাছে বর্ণনা করে দেন। আর অন্যরা সূফীদের উপর নির্ভর করে অন্যদের কাছে বর্ণনা করে দেয়। তাইতো ইমাম মুসলিম রহ. স্বীয় সহীহ এর শুরুতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে ওয়ায়েজদের বর্ণনা। কেননা তারা অধিকাংশ সময় মজলিস জমানোর উদ্দেশ্যে ভুল বর্ণনা করে। আবার কিছু লোক তো এমন আছে যে মানুষদের আখেরাতের বিষয়ে ভয় দেখানোর জন্য মনগড়া হাদীস বানানো জায়েয মনে করে।

ওয়ায়েজদের বর্ণনা বিশেষ করে মাওযু কিতাবে পাওয়া যায়। হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ. এক মসজিদে নামায আদায় করছিলেন। নামাযের পর এক ওয়ায়েজ ওয়াজ শুরু করল এবং ওয়াজ করতে যেয়ে ঐ ওয়ায়েজ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করল। ওয়াজ শেষ করলে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন হাতের ইশারায় তাকে ডাকলেন। সে মনে করলো যে, তিনি তাকে কিছু দেওয়ার জন্য ইশারা করছেন। বিধায় সে কাছে এলো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই হাদীস কে বর্ণনা করেছে? সে পুনরায় উক্ত দুই ব্যক্তির নামই বললো। সেই নির্বোধ তাঁদেরকে চিনতো না। কিন্তু হাদীসের জগতে যেহেতু তাঁদের দুইজনের নাম প্রসিদ্ধ ছিল তাই সে তাঁদের উভয়ের নাম বলে দিল। তিনি বললেন আমি হলাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন আর ইনি হলেন আহমাদ ইবনে হাম্বল। আমরা তো এই হাদীস তোমাকে শুনাই নি ও আমরা নিজেরা ও ইহা শুনি নি। সে বললো তুমি ই ইবনে মুঈন? তিনি বললেন হ্যা, সে বলতে লাগলো আমি সব সময় শুনে আসতেছিলাম যে, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন নির্বোধ। আজ বাস্তবে দেখলাম। তিনি বললেন সেটা কিভাবে? সে বলতে লাগলো যে, তুমি কি করে মনে করলে যে, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন ও আহমাদ ইবনে হাম্বল তোমরা ই দুই জন? আমি তো ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন ও আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে ১৭

(সতের) খানা হাদসি শুনেছি। আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কষ্টে ও ক্ষোভে নিজ চেহারার উপর কাপড় টেনে দিলেন। অন্যদিকে সে মযাক করতে করতে চলে গেল।[৮৯]

এ কারণেই হযরত উমর রা. এর যুগে ওয়াজ করার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। আবূ নাঈম 'কিতাবুল হুলয়াহ' নামক কিতাবে যুহরী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক, দুই, তিন, চার ব্যক্তি হলে হাদীস বর্ণনা করাতে কোন অসুবিধা নেই তবে যদি মজলিস বড় হয় তখন হাদীস বলা থেকে চুপ থাকো।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাইল এর যখন ধ্বংস শুরু হলো তখন তারা ওয়াজ শুরু করে দিয়েছিলো।[৯০] যায়েন ইরাকী রহ. বর্ণনা করেন যে, ওয়ায়েজদের বিপদের মধ্যে থেকে একটি হলো তারা সকল ধরনের কথা জন সাধারণের সামনে বর্ণনা করে দেয় অথচ তারা এগুলো সব বুঝতে পারে না। এ দ্বারা তাদের ইতেকাদ নষ্ট হয়ে যায়। যখন এটা সত্য ও সহীহ বিষয়ের ক্ষেত্রে হয় তখন ভুল ও মনগড়া বিষয়ের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। (যে সাধারণ মানুষের সামনে ভুল ও মনগড়া কথা বললে আরো বেশী ক্ষতি হয়)

এ কারণেই উলামা কেরামের মাওযূ' বর্ণনা সম্পর্কেও কিতাব লিখতে হয়েছে। তাঁরা মাওযূ' বর্ণনার মাঝে যাচাই বাছাই করেছেন যেমন করেছেন সহীহ বর্ণনার ক্ষেত্রে। যাতে করে পরবর্তী লোকদের সংশয় ও সন্দেহ না থাকে।

---

[৮৯] . مقدمة كتاب الموضوعات لابن الجوزي صـ ٢٢.

৮৯. ইবনুল জাওযী রহ. কর্তৃক রচিত কিতাবুল মাওযূআত এর ভূমিকা, পৃষ্টা- ২২।

[৯০] . مجمع الزوائد' كتاب العلم، باب في القصص، ١٨٩/١، وعزاة إلي الطبراني في الكبير، وقال: رجاله موثقون، واختلف في أجلح الكندي والأكثر علي توثيقه.

৯০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল ইলম ১/১৮৯

অষ্টম কারণ

হাদীসের কিতাবে মু'আনিদ (ইসলামের শত্রু) দের পক্ষ থেকে হস্ত ক্ষেপ

বর্ণনাকারী নিজে গ্রহণযোগ্য, সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবে কোন মুআনিদ ও ভ্রান্ত মতবাদের অধিকারীর পক্ষ থেকে এমন কোন হস্তক্ষেপ হয়েছে যদ্বারা বর্ণনার মাঝে ভিন্নতা তৈরী হয়। বর্ণনাকারী যেহেতু গ্রহণযোগ্য সেহেতু তার বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না অন্যদিকে হস্ত ক্ষেপ কারীর কথা চিন্তা করলে মূল বর্ণনার গড়-বড় হয়ে গেছে। অতএব উসূলবিদগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, হাম্মাদ বিন সালামাহ রহ. এর কিতাবে তাঁর এক ভাতিজা যে রাফেযী হয়ে গিয়েছিলো এক হাদীস অন্ত র্ভূক্ত করে দিয়েছিলো। এই কারণ ও অন্যান্য আরো এমন কিছু কারণ আছে যেগুলো জন সাধারণের সামনে ব্যাখ্যা করার যোগ্য নয়। কেননা এসব বিষয় বুঝতে তাদের বুঝ শক্তি অক্ষম। তারা এ সব ঘটনা দ্বারা এবং নিজেদের কম বুঝ ও ত্রুটিপূর্ণ ইলমের কারণে হাদীসের সকল কিতাব ও বর্ণনা সম্পর্কে মন্দ-ধারণা করবে। এজন্য আমি এ বিষয়টি সংক্ষেপ করেছি। বাস্তবে এই বিষয়গুলো এমন সাধারণ নয় যে, সকলের সামনে এটা প্রকাশ করা যাবে। আর না প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ তা বুঝতে পারবে। এ কারণেই মাশায়েখগন জন সাধারনের সামনে বিশেষ বিশেষ মাসয়ালা আলোচনা করাকে নিষেধ করেছেন। আর এ সকল কারণেই ইল্‌ম শিক্ষা করাকে জরুরী সাব্যস্ত করেছিলেন। যদ্বারা তার যোগ্যতা অর্জন হয়ে যায়। বিশেষ করে উসূলে ফেকাহ ও উসূলে হাদীসের ইলম যাতে করে কথা বুঝা ও যাচাই করার যোগ্যতা হয়ে যায়। যায়েন ইরাকী রহ. এর কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি যে, ওয়ায়েজদের বিপদ-আপদ থেকে অন্যতম হলো জন সাধারণের সামনে এমন সব বিষয় বর্ণনা করা যা তারা বুঝতে পারে না। যদ্বারা তাদের আকীদা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করো যেখানে তাদের আকল পৌঁছে না তখন তা তাদের জন্য ফেৎনার কারণ হবে। হযরত ইমাম মুসলিম রহ.ও স্বীয় কিতাবের

মুকাদ্দামায় উক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৯১] বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী রহ. হযরত আলী রা. থেকেও এ ধরনের বাণী বর্ণনা করেছেন।

যদিও বর্তমানে এই বিষয়টি ভয়ঙ্কর নেই যেহেতু হাদীসের ইমামগণ সহীহ, ভুল বর্ণনা সমূহ যাচাই করে দিয়েছেন। অগ্রহণযোগ্য থেকে গ্রহণযোগ্যকে পৃথক করে দিয়েছেন। একারণে ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় "বুখারী শরীফে" ৬ লক্ষ হাদীস থেকে, ইমাম মুসলিম রহ. তিন লক্ষ হাদীস থেকে এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. ৫ পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করেছেন।

যাহোক আমরা এখানে দ্বিতীয় যুগের আলোচনা শেষ করছি এই জন্য যে, আলোচনার শুরু থেকে এই পর্যন্ত যা বর্ণনা করা হলো তা দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে ভিন্নতার একাধিক কারণ তৈরী হয়েছিল। আর এগুলো ছাড়াও এটা স্পষ্ট হওয়া যুক্তি যুক্তও ছিলো। সেই অনেক কারণ থেকে ১৮ (আঠার) কারণ প্রথম যুগে ও ৮ (আট) কারণ এই দ্বীতিয় যুগে আলোচনা করেছি। এগুলো ছাড়াও যতো বেশী মাধ্যম বৃদ্ধি পেয়েছে ততো বেশী ভিন্নতা ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণেই ইমাম বুখারী রহ. এর কিতাবে যঈফ (দুর্বল) বর্ণনা খুবই কম। এমনকি একেবারেই নেই। এ জন্য যে, তাঁর যুগ ছিলো দ্বিতীয় শতাব্দির শেষ দিকে। দারাকুতনী কিতাবে অনেক বেশী যঈফ (দুর্বল) বর্ণনা এসে গেছে এ জন্য যে, তাঁর যুগ বুখারী থেকে অনেক পরে। আর এ কারণে আইম্মায়ে মুজতাহিদদের যুগ ইমাম বুখারী রহ. থেকেও আগে ছিলো। তাই আইম্মায়ে আরবাআর বর্ণনায় দুর্বলতা খুব কম এসেছে। সর্বশেষ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর যুগ। আর তিনিও ইমাম বুখারী রহ. এর আগের। এ চার ইমামের যুগ পর্যন্ত বর্ণনায় যতটা দুর্বলতা আসে নাই তার চেয়ে বেশী দূর্বলতা এসেছে তাঁদের পরবর্তী যুগে।

সারকথা হলো উপরোক্ত ভিন্নতার কারণ ও বর্ণনার দূর্বলতার কারণে আইম্মায়ে ফেকাহ ও হাদীসের জন্য সেগুলোর যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, গ্রহনযোগ্য বর্ণনাকে আগ রেখেছেন, অগ্রহনযোগ্য

---

[৯১]. مقدمة صحيح مسلم، رقم الحديث-١٤.

৯১. মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪,

ও মিথ্যা বর্ণনাকে বাদ দিয়েছেন। অতপর গ্রহনযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য, রহিত ও রহিত নয় এমন হাদীসগুলোকে পৃথক করেছেন। কিন্তু এরপরও এ সকল বিষয় এমন ছিলো যে, এদের মাঝে ভিন্নতা হয়েছিলো। কারণ এটা জরুরী নয় যে, আমার নিকট যে ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য সে সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা আমার নিকট যে দ্বীনদার হবে সে অন্য সকলের কাছে এমনই হবে। এ ভিত্তিতেই ইমামগনের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। আর হওয়া উচিত ছিলো। কেননা এটা সৃষ্টিগত বিষয়। এজন্য আমরা এখন সংক্ষিপ্ত আকারে সেগুলোর আলোচনা করছি।

তৃতীয় যুগ

মাযহাব ভিন্নতার কারণসমূহ

প্রথম কারণ

হাদীস গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখানের ব্যাপারে মূলনীতি ও মাপকাঠির ভিন্নতা

পূর্বের আলোচনা থেকে এই বিষয় তো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সম্মানিত বর্ণনা কারীগণের পক্ষ থেকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু হস্তক্ষেপ হয়ে গেছে। কখনো বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কখনো বুঝার ক্ষেত্রে। এ জন্য হাদীস ও ফেকাহের ইমামগণের জন্য প্রয়োজন দেখা দিলো যে, সে সকল বর্ণনা গুলোকে সামনে রেখে সেগুলোর মাঝে প্রাধান্য দিবেন ও নিজ বিশ্লেষণ অনুযায়ী সহীহ ও গ্রহনযোগ্য বর্ণনা সমূহকে প্রাধান্য দিবেন। গায়রে সহীহকে আমলের অনুপোযুক্ত সাব্যস্ত করবেন। এ কথা বাস্তব যে, মুজতাহিদ ইমামগণের বাণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে গৃহীত। অনেক সময় সরাসরি শব্দ থেকে নির্গত। আবার কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা থেকে মাসয়ালা নির্গত করার জন্য কিছু উসূল ও মূলনীতির প্রয়োজন আবশ্যক ছিলো। যদ্বারা বিভিন্ন হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেওয়া যায়। আর সে সকল উসূল ও মূলনীতির ক্ষেত্রে ফেকাহ ও হাদীসের ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। এই আলোচনা খুব লম্বা। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফেকাহ হাদীসের কিতাব পড়ানোর পূর্বে এই উদ্দেশ্যেই পড়ানো হয়। উপরোক্ত

আলোচনার সার সংক্ষেপ হলো আইম্মায়ে হাদীস উপরোক্ত কারণ গুলোর ভিত্তিতে হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। (১) মুতাওয়াতির (২) মাশহুর (৩) খবরে ওয়াহেদ।

মুতাওয়াতির ঃ ওই হাদীসকে বলে যার বর্ণনাকারী সকল যুগেই এত অধিক পরিমান ছিলো যে, তাঁরা সকলেই কোন মিথ্যা বা ভুলের উপর একমত হওয়া অসম্ভব। যেমনঃ মক্কা মদীনা ইত্যাদির অস্তিত্তের সংবাদ। এমনিভাবে নামাযের রাকাত, রোজার সংখ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার মাশহুর ঃ এটা প্রথম প্রকারের কাছাকাছি। আমরা এই দুই প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করবো না। কেননা এগুলো সম্পর্কে ইমামগনের বেশী মতানৈক্য নেই। শুধু এটুকু মতানৈক্য আছে যে, মুতাওয়াতিরের জন্য কতজন বর্ননাকারী হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া মাশহুর, মুতাওয়াতিরের হুকুমের অন্তর্ভক্ত, না-কি খবরে ওয়াহেদের, না-কি তৃতীয় একটি প্রকার? (এ বিষয় নিয়ে মতানৈক্য) আমরা এখানে শুধু খবরে ওয়াহেদের আলোচনা করবো অর্থাৎ যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা তাওয়াতিরের সংখ্যায় পৌঁছে না। প্রায় সকল রেওয়ায়েত এই প্রকারের-ই অন্তর্ভূক্ত। এই প্রকার সংক্ষেপে দুই প্রকারে বিভক্ত ঃ (১) মাকবূল, (গ্রহণযোগ্য) (২) মারদূদ, (অগ্রহণযোগ্য)।

হযরত হাফেজ ইবনে হাজর রহ. বলেন প্রথম প্রকার অর্থাৎ মুতাওয়াতির ব্যতীত যতো প্রকার আছে সবগুলো দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ মাকবূল, মারদূদ। মাকবুল যার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর মারদূদ যা গ্রহণযোগ্য হওয়া অগ্রহণযোগ্য হওয়ার উপর প্রাধান্য পায় না (অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য) । সুতরাং যে হাদীসে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী বস্তু থাকে অর্থাৎ কয়েকটি কারণ সহীহ ও গ্রহনযোগ্য হওয়ার দাবী করে অন্যদিকে অন্য কতক কারণ সে হাদীসটা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দাবী করে, সে হাদীসও অগ্রহণযোগ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে যতক্ষন পর্যন্ত উহার গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ সমূহ প্রাধান্য না পাবে। এরপর হাফেজ রহ. বলেন মারদূদ তো ওয়াজিবুল আমল-ই নয়। পক্ষান্তরে মাকবূলও দুই প্রকারে বিভক্ত, ওয়াজিবুল আমল, ওয়াজিবুল আমল নয়। কেননা যদি তা মাকবূল হওয়া স্বত্ত্বেও অন্য কোন হাদীসের সাথে দ্বন্দ হয়ে যায় তাহলে

দেখতে হবে যে, উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় করা যায় কিনা? যদি সমন্বয় করা যায় তাহলে তো অনেক ভাল। যেমন নিম্নোক্ত দুই হাদীসের মাঝে উলামা কেরাম সমন্বয় সাধন করেছেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অসুস্থতা সংক্রামন নয়।[৯২] পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পালায়ন কর যেমন পলায়ন কর নেকড়ে বাঘ থেকে।[৯৩] উক্ত দুই হাদীসে বাহ্যত বৈপরিত্ব রয়েছে অথচ উভয়টি সহীহ ও গ্রহনযোগ্য বর্ণনা। উলামা কেরাম বিভিন্নভাবে সমন্বয় করেছেন। তাঁদের সে সকল বাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো যদি সমন্বয় সম্ভব হয় তাহলে তা অগ্রগণ্য ও প্রধান্য পাবে। আর যদি বৈপরিত্ব পূর্ণ হাদীসগুলোর মাঝে সম্বন্বয় সম্ভব না হয় তাহলে ইতিহাস দেখতে হবে যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে। যদি প্রমাণিত হয় তাহলে পরের হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে দেখতে হবে যে, প্রাধান্য দেওয়ার অন্যান্য কারণ থেকে এমন কোন কারণ আছে কি-না যদ্বারা কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। যদি এটাও না পাওয়া যায় তাহলে উক্ত দুইটি বর্ণনা সহীহ ও মাকবূল হওয়া স্বত্ত্বেও এই বৈপরিত্বের কারণে মারদূদের (অগ্রহণযোগ্য) প্রকার ভূক্ত হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে উলামাগণের মাঝে দীর্ঘ দুইটি আলোচনা রয়েছে। প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যানের কারণ সমূহ অর্থাৎ কোন কোন কারণে হাদীস যঈফ ও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রাধান্যের কারণ সমূহ অর্থাৎ ভিন্ন দুইটি বর্ণনার মাঝে দুইটি সহীহ হওয়া সত্ত্বেও কোন্ পদ্ধতিতে প্রাধান্য

---

[৯২]. البخاري، كتاب الطب،باب لاهامة، رقم الحديث-٥٧٥٧،
ومسلم، كتاب السلام، باب لا عدوي و لا طيرة، رقم الحديث-٥٧٨٩،
وأبو داود، كتاب الطب، باب في الطيرة، رقم الحديث-باب من كان لا يعجبه الفال و يكره لاطيرة،
رقم الحديث-٣٥٣٥، عن أنس و ابن عباس رضي الله عنهما.

৯২. বুখারী, হাদীস নং- ৫৭৫৭, মুসলিম, হাদীস নং- ৫৭৮৯, আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৩৫৩৭, ৩৫৩৯।

[৯৩]. البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، رقم الحديث-٥٧٠٧، عن أبي هريرة

৯৩. বুখারী, হাদীস নং- ৫৭০৭.

দেওয়া যায়। উক্ত দুইটি মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে যে পরিমান শাখাগত মতানৈক্য উলামাগণের মাঝে হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত। বিগত কায়দায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই হাদীসে যখন ভিন্ন ভিন্ন দুইটি বিষয় প্রমাণিত হয় তখন এটা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক আলেমের কাছে তা বিপরিত হবে। বরং এর উদ্দেশ্য কোন মুজতাহিদের কাছে এমন যা অন্য হাদীসের বিপরিত নয়। এর পর যদি বিপরিত মেনে নেওয়াও হয় তাহলে এটা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সেগুলোর মাঝে সমন্বয়ের কোন পদ্ধতি থাকবে না। আর এটা খুবই সম্ভাবনা যে, কারো কাছে সমন্বয়ের কোন পদ্ধতি থাকবে আর কারো কাছে থাকবে না। এরপর যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, সমন্বয়ের কোন পন্থাই নেই তাহলে এর বিশ্লেষণের জন্য একাধিক মত হওয়া স্পষ্ট কথা। কেননা কোন হাদীস পূর্বের ও কোন হাদীস পরের এ বিষয়েও মতানৈক্য হওয়া জরুরী। কেননা ইহা খুব সম্ভব যে, কারো কাছে এমন কিছু করীনা বা আলামত আছে যদ্বারা সে কোন একটিকে পরের ও রহিতকারী মনে করে আর অন্য টিকে রহিত। কিন্তু অন্যের কাছে সেই করীনা বা আলামত উক্ত বিষয়ের দলীল নাও হতে পারে। যদি একথাও মেনে নেওয়া হয় যে, পূর্বের-পরের বিষয়টি প্রমাণিত নয়, তাহলে এ অবস্থায়ও মতানৈক্য জরুরী। কেননা কারো নিকট বর্ণনা সমূহের মাঝে কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো অন্যের নিকট নেই। সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা কোথাও এ বিষয়ে আলোচনা করবো। আর মতানৈক্যের এ সকল দিক মুজতাহিদদের নিকট মতানৈক্যের কারণ। এ সকল বিষয় সৃষ্টিগত ও স্পষ্ট বিষয়। যেমন একজন বর্ণনাকারী কোন কথা বর্ণনা করলেন, যায়েদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য পক্ষান্তরে আমরের নিটক তা মিথ্যাবাদী হতে পারে। যায়েদের নিকট সে বুঝমান, আমরের নিকট সে বেওকুফ। যায়েদের নিকট তার বর্ণনা সত্য পক্ষান্তরে আমরের নিকট তার বর্ণনা মিথ্যা ও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার উপযুক্ত নয়। এ ধরনের আরো অনেক কারণ রয়েছে।

মোট কথা উপরোক্ত কারণ সমূহ নিয়ে হাদীস ও ফেকাহের ইমামগণের মাঝে অনেক শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে। যেগুলোকে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেখাতে চেয়েছি যে, ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য

হয়েছে উক্ত কারণ সমূহের কোন এক কারণে। আর সেগুলোর সমাধান দুই অবস্থায় সম্ভব যথাঃ (১) পরবর্তীতে আগত ব্যক্তি স্বয়ং নিজে এ পরিমাণ যোগ্যতা রাখবে যে, উক্ত কারণসমূহের আলোকে একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিবে ও সে অনুপাতে আমল করবে। ইনশাআল্লাহ সে সঠিক পথ অবলম্বনকারী ও সওয়াব প্রাপ্ত হবে। এদেরকেই আমরা মুজতাহিদ বলে থাকি। (২) এ পরিমাণ যোগ্যতা তার নাই যে সে বিপরিতমুখি বর্ণনা সমূহের মাঝে প্রাধান্য দিতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য উচিত কোন বিজ্ঞ ইমামের অনুসরণ করা। কেননা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, রাস্তা যখন অস্পষ্ট হবে তখন যদি সে দক্ষ হয় তাহলে নিজে আগে বাড়বে। দক্ষ না হলে অন্য কারোর অনুসরণ করবে। তবে এ কথা যাচাই করার পর যে, যার অনুসরণ করবে সে নিজে দক্ষ কি-না এবং তার গন্তব্য কোথায়। আর অবস্থা এই যে, প্রশস্ত রাস্তায় যদি যে কেউ এক জনের পিছনে চলতে থাকে তাহলে বিপথগামী ও পথহারা হওয়া ছাড়া আর কি হবে? এ কারণেই উলামা কেরামের "আকলীদে শখসী" (নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণ করা) কে জরুরী বলেছেন ও "তাকলীদে গায়রে মুআয়্যিন" (নির্দিষ্ট না করে যার ইচ্ছা তার অনুসরণ করা) কে নিষেধ করেছেন।

সারকথাঃ উক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে উলামাগণের মাঝে সতন্ত্র দুইটি দল হয়ে গেছে। প্রথম নিন্দার কারণ সমূহ অর্থাৎ কি কারণে হাদীসের বর্ণনাকে দোষযুক্ত সাব্যস্ত করা যায়। মুহাদ্দিসগণ নিন্দার কারণ দশটি সাব্যস্ত করেছেন। যে গুলোর পাঁচটি বর্ণনাকারীর আদালত (ন্যায়পরায়নতা) সম্পর্কিত আর বাকী পাঁচটি তার মেধা শক্তি সম্পর্কিত। আদালত (ন্যায়পরায়নতা) সম্পর্কিত পাঁচটি নিম্নরুপঃ (১) বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হওয়া, (২) মিথ্যাবাদীর অপবাদে অপবাদিত হওয়া, (৩) ফাছেক হওয়া, ব্যাপক চাই তা কার্যত হোক যেমন ব্যভিচার ইত্যাদি অথবা কথাগত যেমন গীবতকারী, (৪) বেদআতী হওয়া ও (৫) অবস্থা অজানা থাকা।

আর মেধাশক্তি সম্পর্কিত পাঁচটি নিম্নরুপঃ (১) অধিকাংশ ভুল বর্ণনা করা, (২) বর্ণনার ক্ষেত্রে গাফলতি করা, (৩) কোন সন্দেহ বা ওহাম সৃষ্টি করা, (৪) গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরিত বর্ণনা করা ও (৫) মেধাশক্তিতে কোন ত্রুটি হওয়া। উক্ত দশটি কারণ সম্পর্কে উলামাকেরামের

মাঝে দুই দিক দিয়ে মতানৈক্য হয়ে গেছে। প্রথমতঃ উক্ত কারণ গুলো কোন সীমায় পৌঁছলে বর্ণনাকে যঈফ বা দুর্বল বলা হবে। যেমনঃ বেদআতী হওয়া এটা কি সাধারনভাবেই বর্ণনাটি দুর্বল বা যঈফ হওযার কারণ না-কি বেদআতের অনুকুলে বর্ণনা হলে যঈফ বা দুর্বল হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত ঃ বর্ণনাকারীর ব্যাপারো উক্ত দশটি দোষের কোন একটি দোষ পাওয়ার যাওয়ার যে কথা বলা হল যে, হয় তার মাঝে কোন একটি দোষ আছে কি-না। যেমন ঃ মিথ্যার অপবাদে অপবাদিত হওয়া। এক জনের কাছে সে মিথ্যার অপবাদে অপবাদিত। পক্ষান্তরে অন্য জনের কাছে বর্ণনাকারীদের ভুল, সে সত্যবাদী। এমনিভাবে অন্যান্য কারণগুলোতেও ফেকাহ ও হাদীসের ইমামগনের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাছাড়া উপরোক্ত দশটি কারণ ছাড়াও দূর্বলতার আরো কিছু কারণ নিয়ে উলামাকেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমনঃ সনদের মাঝ থেকে কোন বর্ণনাকারীকে বাদ দেওয়া। এক জামাতের মতে এটা নির্দিধায় দুর্বলতার কারণ এবং তার এই বর্ণনা দূর্বল যঈফ হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে উলামাদের অন্য জামাতের মতে নিম্মোক্ত কারণ ব্যাপকভাবে নয় যে, যে কোন স্থান থেকেই বর্ণনাকারী বাদ পরবে তা যঈফ হয়ে যাবে (এমনটি নয়) বরং তাঁদের মতে এতে নিম্মোক্ত ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তার ঐ বর্ণনাটা দুর্বল বা যঈফ হবে। ব্যাখ্যা হলো যে মাঝ থেকে যে বর্ণনাকারীকে বাদ দেওয়া হবে হয় তিনি সাহাবী হবেন বা তার নিম্মের কোন বর্ণনাকারী হবেন। এমনিভাবে বাদ দাতা নিজে নির্ভরযোগ্য কি-না? এ ধরনের অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোতে উলামা কেরামের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে, যে এগুলোর কারণে বর্ণনায় দূর্বলতা আসে কি-না? এক দলের মতে সেগুলো দূর্বলতার কারণ। সুতরাং তাদের মতে যে বর্ণনায় উপরোক্ত কারণ সমূহ থেকে যে কোন একটি কারণ পাওয়া যাবে সে বর্ণনা দুর্বল যঈফ হয়ে যাবে। আর সেই (দুর্বল) হাদীস থেকে যে মাসআলা নির্গত হবে প্রমাণিত হবে না। পক্ষান্তরে যাদের মতে উপরোক্ত কারণগুলো দুর্বলতার কারণ নয় বা সেগুলো কিছু ব্যাখ্যা আছে তাদের মতে ওই সকল বর্ণনা যেগুলোতে উপরোক্ত কোন কারণ পাওয়া যায় সেগুলোতে তাদের কাছে দুর্বল হবে না। আর এ ধরণের হাদীস থেকে যে মাসয়ালা নির্গত হবে তা তাদের কাছে

প্রমাণিত হবে এবং ঐ ধরণের হাদীস দলীল দেওয়ার উপযুক্ত। (অথচ এ ধরণের হাদীস প্রথমে উপরে আলোচিত লোকদের নিকট দলীলের উপযুক্ত নয়)

মন চায় এই বিষয়টি অনেক ব্যাখ্যা সহকারে লিখি। উপরোক্ত কারণগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এটা স্পষ্ট করি যে কোন পর্যায়ে কি মতানৈক্য। কিন্তু তা ইলমী আলোচনা হওয়ায় সাধারণের বিরক্তির কারণ হবে। আলোচনা দীর্ঘায়িত হবে তাই সংক্ষিপ্ত করলাম। তবে প্রকৃত পক্ষে ইমামগণের নিকট এটা মতপার্থক্যের অনেক বড় একটা কারণ। কেননা কোন কোন ইমামের নিকট কিছু কারণ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি করে আবার অন্য ইমামগণের নিকট ঐ বিষয়টি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি করে না। এদিক লক্ষ্য করে উলামায়ে কেরাম উসূলে হাদীসে তথা হাদীসের মূলনীতি বিষয়ক কিতাবগুলো হাদীস পড়ানোর পূর্বেই পড়া জরুরী মনে করতেন। যখন এ মূলনীতিগুলো জানা থাকবে তখন হাদীস পড়ার সময় এ সন্দেহ আসবে না যে ইমামগণ কেন এ হাদীসের বিরুদ্ধে মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে মন চাচ্ছিল যে, যারা হাদীসের তরজমা পড়েন, তাদেরকে তরজমা পড়ার আগে হাদীসের মূলনীতি সম্পর্কে মৌলিক কিছু ধারণা দিয়ে দেওয়া যাতে করে সাধারণ জনগণ হাদীসের তরজমা পড়ে গোমরাহ না হয় বা মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে অনিহা ও অনাগ্রহ সৃষ্টি না হয়। হাদীসের ব্যাপারে খারাপ ধারণা না আসে। (ইমামগণের ব্যাপারে খারাপ ধারণা বা খারাপ মন্তব্য না করে) আর এ সবগুলোই দ্বীনের ক্ষেত্রে বড় ক্ষতিকারক।

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

অর্থৎ আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথ দেখান। (সূরা বাকারা,আয়াত-২১৩) এই কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে যদ্বারা বর্ণনা ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়, তার উপর আমল করা যাবে না। আর এ সংক্রান্ত ইলম না থাকলেই এ হাদীসের উপর আমল করা জায়েয হবে না।

'তাযকিরা' নামক কিতাবের লেখক লিখেছেন যে, হাদীস সমূহের একটি খুব সুক্ষ ও নাজুক বিষয় হচ্ছে জালিয়াতকারী ও ওয়ায়েজদের পক্ষ থেকে অনেক জাল হাদীস বানিয়ে দেওয়া। এ ছাড়াও অনেক দ্বীনদার

গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদেরও হাদীসের অর্থ বুঝতে ভুল হয়ে যাওয়া। এজন্য মুজাতাহিদগণ হাদীস যাচাই করার জন্য একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তারা যে উসূলও মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন সে উসূল ও মাপকাঠি সাধারণ মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীস যাঁচাই করার জন্য নির্ধারিত উসূল ও মাপকাঠি থেকে ভিন্ন। এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ ওই সাধারণ উসূল যা মুহাদ্দিসগণের কায়দা অনুযায়ী হাদীস সমূহ যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত। ফুকাহাগণ হাদীস যাচাই-বাছাই ও প্রাধান্য দেওয়ার জন্য উসূল বর্ণনা করেছেন যেগুলোকে উসূলে ফেকহে বাবুস সুন্নাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়। উদাহরণ স্বরুপ আমরা সংক্ষেপে কিছু হানাফী উসূল বর্ণনা করছি, যদ্বারা বুঝা যাবে যে, হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য কোন কোন বিষয় জানা থাকা জরুরী। আর হাদীস অনুযায়ী আমলের দাবীদাররা এ সম্পর্কে কি পরিমাণ বে-খবর।

উসূলবিদগণ বলেছেন, এ সকল বিষয় ছাড়াই কুরআনের ইলমের জন্য আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা জানা থাকা জরুরী যে, এই হুকুমটি আম, না খাস। এই শব্দটি এক অর্থবোধক, না একাধিক অর্থবোধক। এই শব্দটি স্বীয় অর্থে স্পষ্ট, না অস্পষ্ট কোন অর্থ আছে। এই আদেশটি ওয়াজিবের জন্য, না মুস্তাহাবের জন্য, না ধমকীর জন্য, না অনুমতির জন্য, মোট কথা এ সকল নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হওয়া তো একান্ত জরুরী। যেগুলো কুরআন শরীফ ও হাদীসের অর্থের সাথে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু ওই সকল আহকাম জানাও জরুরী যেগুলোর সম্পর্ক শুধু হাদীস শরীফের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এই আহকাম চার প্রকারে বিভক্ত।

প্রথমতঃ আমাদের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছার পদ্ধতি অবগত হওয়া জরুরী। কেননা, হাদীসসমূহে বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কিছু হাদীস মুতাওয়াতির। কিছু মাশহুর বা আহাদ হয়ে থাকে। যেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা উপরে করেছি। মোটকথা, হানাফীদের উসূল অনুযায়ী হাদীসের সনদ বা সূত্রধারার পরস্পরের সম্পর্কের দিক লক্ষ্য করে হাদীস তিন প্রকার। ১. মুতাওয়াতির। ২. মাশহুর। ৩. খবরে ওয়াহেদ।

মুতাওয়াতিরের আলোচনা পূর্বে চলে গেছে।

মাশহুরঃ ঐ হাদীস যার প্রথমস্তর অর্থাৎ সাহাবীদের যামানায় এক দুইজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে নিম্নস্তরে এসে তার বর্ণনাকারী মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছে গেছে।

খবরে ওয়াহেদঃ যে হাদীসের সনদ শেষ পর্যন্ত মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছে না।

তৃতীয় এই প্রকারের হাদীস সম্পর্কে উলামাগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে আমল করা ওয়াজিব কি না। হানাফীদের মতে এতে ব্যাখ্যা রয়েছে। অর্থাৎ কখনো কখনো ওয়াজিব। কখনো ওয়াজিব না। মালেকীদের মতে যদি কিয়াসের বিপরিত হয় তাহলে তার উপর আমল করা ওয়াজিব না। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে যদি তার বর্ণনাকারী ফকীহ হয় কথার মূলে পৌছতে পারে যেমনঃ খোলাফায়ে রাশেদীন রা. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রা. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. মুয়ায ইবনে জাবাল রা. আয়েশা রা. ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে এ হাদীসের উপর নির্দিধায় আমল করা ওয়াজিব। চাই তা কিয়াস অনুযায়ী হোক বা কিয়াসের বিপরিত হোক। আর যদি সে হাদীসের বর্ণনাকারী ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধ না হয় তাহলে তার বর্ণনা দিরায়েতের (জ্ঞান, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার) বিপরিত হলে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণেই যখন হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করলেন যে, আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযু ভেঙ্গে যায়। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমরা গরম পানি দ্বারা ওযু করলেও কি পুনরায় ওযু করতে হবে?[৯৪] সুতরাং এই হাদীস দলীলের উপযুক্ত না। আর যদি হাদীসের বর্ণনাকারী বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ না হয় আর তার থেকে বর্ণনাকারী গ্রহণযোগ্য হয় ও নির্দিধায় বর্ণনা করে দেয় তাহলে তাকেও (অর্থাৎ যার থেকে বর্ণনা করেছে তাকে) প্রসিদ্ধ

---

[৯৪]. الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء، مما غيرت النار، رقم الحديث-٨٩، ولم يحكم عليه الترمذي شيئا.

وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء، مما غيرت النار، رقم الحديث-٤٨٥، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

৯৪. তিরমিযী, হাদীস নং ৮৯, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৪৮৫.

মনে করা হবে। কিন্তু প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জন্য চারটি শর্ত আবশ্যক। ১. মুসলমান হওয়া। ২. বিবেকবান হওয়া। ৩. সুস্থ মেধা সম্পন্ন হওয়া। ৪. ফাসেক না হওয়া।

উক্ত চারটি শর্তের জন্য আরো ব্যাখ্যা রয়েছে যা স্বস্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ কি পরিমাণ মেধা ইত্যাদি প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরুপ ফাসেক না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হওয়া ও ছগীরা গুনাহ বারবার না করা।

এমনিভাবে আয়ত্ব করার শক্তির ব্যাপারেও শর্ত রয়েছে অর্থাৎ হাদীসটি শোনার সময় যথাযথভাবে শুনেছে কি না, শোনার সময় তার অর্থ বুঝে শোনা এবং পরবর্তীতে অন্যের কাছে পৌছানো পর্যন্ত তা স্মরণ রাখা।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসের সনদ ইত্তেসাল (যুক্ত) ও ইনকেতা (বিচ্ছিন) হওয়া হিসেবে আলোচনা। উসূলবিদগণ ইনকেতা (বিচ্ছিনতা) কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. বাহ্যিক ইনকেতা, অর্থাৎ সনদের মাঝে থেকে কোন মাধ্যম বাদ পড়া চাই তিনি সাহাবী হোন বা অন্য কেউ। ইমামগণের মাঝে এই মাসআলায়ও মতানৈক্য রয়েছে যে, কোন অবস্থায় উক্ত হাদীস দলীল দেওয়া যোগ্য আর কোন অবস্থায় যোগ্য নয়।

২য় বাতেনী ইনকেতা, বাস্তবে এটা ইনকেতা হিসেবে ব্যক্ত করা সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও নবীর হাদীসের প্রতি সীমাহীন সম্মানের কারণে। অন্যথায় এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইনকেতা নয়। এ কারণে ফেকাহ ও উসূলের অন্যান্য ইমামগণ এটাকে ইনকেতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন না। মোটকথা এটা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। প্রথমতঃ আল্লাহর কিতাবের বিপরিত হওয়া উসূলবিদগণ এটার উদাহরণ পেশ করেন। لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎ সূরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামায জায়েয নেই।[৯৫] যেহেতু এই হাদীসটি কুরআনে কারীমের এ আয়াত فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

---

[৯৫] . الترمذي، كتاب المواقيت، باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، رقم الحديث-٢٤٧، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح.

৯৫. তিরমিযী, হাদীস নং- ২৪৭.

এর ব্যাপকতার বিপরিত। এজন্য উসূলবিদগণের নিকট এতে কোন বাতেনী ইনকেতা হয়েছে।

দ্বিতীয় কোন মাশহুর হাদীসের বিপরিত হওয়া, যেমন, حديث القضاء بشاهد ويمين অর্থাৎ সাক্ষী একজন থাকা অবস্থায় অপর সাক্ষীর পরিবর্তে শপথ নেওয়া হবে এবং এক সাক্ষী ও এক শপথ অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে।[৯৬]

উক্ত হাদীসটি নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ হাদীস اَلْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَي مَنْ اَنْكَرَ [৯৭]এর বিপরিত হওয়ার কারণে উক্ত হাদীসটি দলীল হওয়ার উপুক্ত নয়।

এমনিভাবে প্রসিদ্ধ কোন ঘটনা যা সাধারণত ঘটে থাকে তাতে দুই একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক এমন কোন বিষয়ের আলোচনা করা যে বিষয়ে অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক আলোচনা না করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, এ

---

[৯৬]. أبو داود. كتاب القضاء، باب القضاء باليمين مع الشاهد، رقم الحديث-٣٦١٠.

والترمذي، كتاب الأحكام، باب في اليمين مع الشاهد' رقم الحديث-١٣٤٢.

و أبن ماجه، كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، رقم الحديث-٢٣٦٨.

كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال المنذري، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب.

৯৬. আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬১০, তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৪২, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৩৬৮.

[৯৭]. البخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة علي المدعي واليمين عليه، رقم الحديث-٢٥١٤.

ومسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين علي المدعي عليه، رقم الحديث-٣٦١٩.

والترمذي، كتاب الأحكام، باب النينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه، رقم الحديث-١٣٤١.

والنسائي، كتاب اداب القضاء، عطة الحاكم علي اليمين، رقم الحديث-٥٤٢٧.

وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب البينة علي المدغي و اليمين علي المدعي عليه، رقم الحديث-٢٣٢١. كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا، وقال: هذا حديث في إسناده مقال و محمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك و غيره.

৯৭. বুখারী, হাদীস নং ২৫১৪, মুসলিম, হাদীস নং ৩৬১৯, তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৪১, নাসায়ী, হাদীস নং ৫৪২৭, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৩২১.

হাদীসে কোন গড় বড় হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবীদের যুগে কোন মাসআলা সম্পর্কে সাহাবীগণ কর্তৃক তা প্রত্যাখান করার পর নিজ ইজতিহাদ আনুযায়ী কোন হুকুম দেওয়া সেই হাদীস দ্বারা দলীল না দেওয়াও দোষযুক্ত হওয়ার অন্তর্ভূক্ত।

এমনিভাবে কোন বর্ণনাকারী কর্তৃক নিজ বর্ণিত হাদীস অস্বীকার করা অথবা সেই হাদীসের বিপরিত আমল করা বা ফাতওয়া দেওয়াও বর্ণনাটি দোষযুক্ত হওয়ার অন্তর্ভূক্ত। এই আলোচনা দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। উসূলবিদগণ অনেক ব্যাখ্যা ও স্পষ্টভাবে এ সকল বিষয়কে দলীল ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। যার মন চায় সে যেন লেখাগুলো দেখে নেয়।

আমার উদ্দেশ্য হল, সমস্ত ইমামগণের মতে চাই তারা ফকীহ্ হোন বা মুহাদ্দিস হোন তাদের কাছে হাদীসের জন্য এমন কিছু উসূল ও কায়দা রয়েছে, যেগুলো দ্বারা হাদীস পরিমাপ ও তার স্তর এবং সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব কি না তা জানা যায়। সে সকল কায়দার ভিন্নতার কারণেই ইমামগণের মাঝে অনেক বর্ণনার ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে। কেননা, কতকের কাছে কোন একটি হাদীস অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে এ জন্য যে, তাদের যাচাইয়ে সেই হাদীস মাপকাঠি অনুযায়ী হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যদের কাছে তা আমল ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা, তাদের যাচাইয়ে সেই হাদীস দলীল ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার স্তরে কোন কারণে পৌছে নাই। উক্ত দুই মতামতের ব্যাপারে কেবল ওই ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারবে যে, উভয় দলের যাচাইয়ের উসূল সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। পক্ষান্তরে যে এগুলো সম্পর্কে অবগত নয় সে নিজেই পথহারা সে কি করে অন্যকে পথ দেখাবে?

বাস্তবে এ সকল গায়রে মুকাল্লিদিনদের দেখে অবাক লাগে যারা জন সাধারণকে এই বলে ভ্রান্ত করে যে, যা মাযহাবের অনুসরণ করে তারা ইমামগণের অনুসরণ করতে যেয়ে হাদীসের কোন পরওয়া করে না। জন সাধারণ যারা কোন ইমামের অনুসরণ করে না তাদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই কেননা, তারা তো নিজেরাই অজ্ঞ। আলেমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কেননা, তারা সকল বিষয়ে অবগত হয়েও গোপন করে ও বাস্তব বিষয়ে পর্দা টেনে দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়। ইমামগণের শান অনেক

উচু। এ বিষয়ে তো একজন সাধারণ মানুষ ও সহ্য করবে না যে, হাদীসের মোকাবেলায় ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদের মোকাবেলায় বড় থেকে বড় কোন ব্যক্তির কথা মেনে নিবে। কিন্তু নিশ্চিত বিষয় হল, হাদীস একত্রিত করা, সেগুলো প্রাধান্য দেওয়া সমন্বয় করা, এ সকল বিষয়ে সমকালিন উলামাগণের মোকাবেলায় ইমামগণের বাণী, তাদের প্রাধান্য দেওয়া অগ্রগণ্য ও আবশ্যকভাবে পালনীয়। যা অস্বীকার করা যুলুম ও বাড়াবাড়ির। মোটকথা ইমামগণের মাঝে মতানৈক্যের অন্যতম কারণ হল, বিভিন্ন বর্ণনার প্রাধান্য দেওয়া অর্থাৎ একাধিক বর্ণনার মাঝে কোন ইমামের কাছে কতক বর্ণনা প্রাধান্য পায় আবার অন্যদের কাছে অন্য বর্ণনা প্রাধান্য পায়। কোন এক দলের কাছে এক ধরনের বর্ণনা প্রাধান্য পায়, তাদের কাছে সে হুকুমটি বিপরিত বাকী সব বর্ণনা প্রাধান্য পায় না, বরং অন্য বর্ণনা যেগুলো তাদের কাছে প্রধান্য পায়নি সে বর্ণনা ব্যাখ্যার যোগ্য।

ইমামগণের মতানৈক্যের ব্যাপারে লিখিত কিতাব সমূহ, যেমন, শারানী রহ. কর্তৃক মীযান। কিতাবুল মুগনী, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, কাশফুল গুম্মাহ এ ধরণের কিতাবসমূহ যারা মুতালাআ করেছে তারা এ বিষয় সম্পর্কে অবগত যে, ইমামগণের সবকিছুর ভিত্তি নবুওয়াতের চেরাগ (অর্থাৎ হাদীস) থেকে গৃহীত। শুধু মাত্র ইল্লাত (কারণ) ও মাসায়েলের ইস্তিখরাজের (মাসয়ালা নির্গত করার নীতির) পার্থক্য হয়। উদাহরণ হিসাবে বিদায়াতুল মুজতাহিদ নামক কিতাবের একটি পরিচ্ছেদ, সার সংক্ষেপ উল্লেখ করছি। যদ্বারা এটা স্পষ্ট হবে যে, আয়াত ও হাদীসই হল, ইমামগণের বর্ণনার উৎস স্থল। তবে মাসয়ালা নির্গত করার নীতিমালার পদ্ধতি ভিন্ন।

ইবনে রুশদ রহ. বলেন, ওযু ভঙ্গের ব্যাপারে মূল হল আল্লাহ তাআলার বাণী اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ (সূরা নিসা, আয়াত-৪৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ مَّنْ أَحْدَثَ حَتّٰي يَتَوَضَّأَ অর্থাৎ কেউ অপবিত্র হলে সে পবিত্র হওয়ার

আগ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তার নামাজ কবুল করেন না।[৯৮] এ হাদীস দ্বারা পেশাব পায়খানা, বায়ু, মযী ও ওদী দ্বারা ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। এ সম্পর্কে আরো সাতটি মাসাআলা যা কায়দায়ে কুল্লির (মূলনীতি) পর্যায়ে রয়েছে সেগুলোতে মতানৈক্য রয়েছে।

প্রথমতঃ ওই সকল বস্তু যা পায়খানা-পেশাবের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে বের হয়। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম তিনটি মত রয়েছে। যারা উপরোক্ত আয়াতে নাপাক বের হওয়াকে ওযু ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে শরীরের যে কোন স্থান থেকেই নাপাক বের হোক তা ওযু ভেঙ্গে দিবে। কারণ ওযু ভঙ্গের কারণ পাওয়া গেছে। এরা হলে ইমাম আবু হানীফা ও তার অনুসারীরা, ইমাম সাওরী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.। এক দল সাহাবীও উক্ত মত পোষণ করেন। তাদের আছার এ মতের একটা দলীল। তাদের মতে যে কোন নাপাকী শরীরের যে কোন স্থান থেকে বের হোক না কেন তা ওযু ভেঙ্গে দিবে। যেমন, রক্ত, নাকসীর, (নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া) বমী ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মত হল, অন্যান্য ইমামগণের মত। তারা উল্লেখিত আয়াতে ওযু ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করেছেন, সামনে ও পিছনের পথ দিয়ে কিছু বের হলে। তাদের মতে এ দুই পথ দিয়ে যা কিছু বের হোক না কেন, চাই রক্ত বা পাথর আর সুস্থ অবস্থায় বের হোক বা অসুস্থ অবস্থায় সব ওযু ভঙ্গের কারণ হবে। আর এ দুই পথ ভিন্ন অন্য কোথাও দিয়ে কোন কিছু বের হলে এদের মতে ওযু ভঙ্গের কারণ হবে না। এরা হলেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. ও তাঁর অনুসারীগণ।

তৃতীয় দল হল, যারা বের হওয়া ও বের হওয়ার স্থান উভয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তারা বলেন, এ দুই পথ দিয়ে যে স্বাভাবিক বস্তু বের হয় যেমন, পেশাব, মযী ইত্যাদি তা দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। আর যে বস্তু স্বাভাবিক নয়, যেমন, পোকা, রক্ত ইত্যাদি তা দ্বারা ওযু নষ্ট হবে না। এ

---

[৯৮] البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، رقم الحديث-١٣٥.

ومسلم، كتاب الطهارة،باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم الحديث-٥٠٧، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

৯৮. বুখারী, হাদীস নং ১৩৫, মুসলিম, হাদীস নং ৫০৭.

মত পোষণ করেন ইমাম মালেক ও তার অনুসারীগণ। এ আয়াত দ্বারাই চার ইমাম দলীল পেশ করেন ও মাসআলা বের করেন। কিন্তু ওযু ভঙ্গের কারণের ক্ষেত্রে যেহেতু ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে, সেহেতু হুকুমের ক্ষেত্রেও মতানৈক্য হয়েছে। আর এ ভিত্তিতেই বাণী ও বর্ণনার ক্ষেত্রে মতানৈক্য হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে আয়াতে যদিও দুই পথ থেকে যা বের হবে তা খাছ কিন্তু এটা একটি উদাহরণ আর তার হুকুম ব্যাপক। এই জন্য যে মহিলার ঋতু স্রাব ছাড়া রক্ত বের হচ্ছে এবং এ ধরণের ব্যক্তিদের জন্য সকল বর্ণনায় ওযুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো দ্বারা এই হযরতগণ সমর্থন গ্রহণ করেন। আর ইমাম মালেক রহ. এর মতে যেহেতু এ হুকুমটি খাছ ছিলো সেহেতু মুস্তাহাযা (হায়েয ছাড়াও যদি লজ্জা স্থান থেকে রক্ত বের হয় তার) জন্য সকল বর্ণনায় ওযুর হুকুম রয়েছে। তিনি সেগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন ও অতিরিক্ত ওযুকে অপ্রমাণিত ও অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

এমনিভাবে দ্বিতীয় মাসয়ালা ঘুম। এ ব্যাপারেও উলামা কেরামের তিনটি মত রয়েছে। কতকে যে কোন ঘুমকে ওযু ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। কতকে যে কোন ঘুমকে ওযু ভঙ্গের কারণ নয় হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। আর তৃতীয় এক দল উলামা কেরাম ব্যাখ্যা করেছেন যে কয়েক ধরণের ঘুম ওযু নষ্ট করে দেয়। আর কয়েক ধরণের ঘুম নষ্ট করে না। এ মতানৈক্য এ জন্য হয়েছে যে, ঘুমের ব্যাপারে দুই ধরণের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিছু বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঘুম ওযু নষ্ট করে না। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়মুনা রা. এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন ও আরাম করলেন, এমনকি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম অবস্থায় নাক ডাকার আওয়াজ শুনেছি। অতঃপর তিনি উঠে নামায আদায় করলেন কিন্তু ওযু করলেন না।[৯৯]

---

[৯৯]. البخاري، كتاب العلم، باب السمر في العلم، رقم الحديث-١١٧.

وأبو داود، كتاب التطوع،باب في صلاة الليل، رقم الحديث-١٣٥٧، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

৯৯. বুখারী, হাদীস নং ১১৭, আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩৫৭.

এমনিভাবে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কতক সাহাবা মসজিদে বসে নামাযের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় তন্দ্রা যাচ্ছিলেন অতঃপর তাঁরা নামায আদায় করলেন।[১০০] পক্ষান্তরে অন্যান্য বর্ণনা এর বিপরিত যেমন হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, পেশাব পায়খানা অথবা ঘুমের কারণে মোজা খোলার প্রয়োজন নেই। মাসাহ যথেষ্ট। অবশ্য জানাবাত অবস্থায় মাসাহ যথেষ্ট হবে না।[১০১]

এমনিভাবে আবু হুরায়রা রা.এর বর্ণনার ওযু ওই ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে শুয়ে ঘুমাবে ইত্যাদি।[১০২] উলামা কেরাম উক্ত দু ধরণের বর্ণনার কারণে দুই পন্থা অবলম্বন করেছেন। কেহ কেহ কোন একটা বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়াকে গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও দুই ভাগ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এক ভাগ প্রথম প্রকারের বর্ণনাগুলোকে প্রধান্য দিয়েছেন। আর তাঁরা এ প্রাধান্য দেওয়ার অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনাসমূহ অপ্রাধান্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা এর বিপরিত মনে করেন। আর তৃতীয় দল উভয় প্রকারের হাদীসকে প্রাধান্য

---

[১০০] . أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم الحديث-٢٠٠، عن أنس رضي الله عنه. وسكت عنه المنذري.

১০০. আবু দাউদ,হাদীস নং ২০০.

[১০১] . الترمذي، كتاب الطهارة، باب المسح علي الخفين للمسافر والمقيم، رقم الحديث-٩٦. والنسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط، رقم الحديث-١٥٩. وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم الحديث-٤٧٨، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

১০১.তিরমিযী, হাদীস নং ৯৬, নাসায়ী, হাদীস নং ১৫৯, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪৭৮.

[১০২] . أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم الحديث-٢٠٢، قال أبو داود: قوله: الوضوء علي من نام مضطجعا، هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وأخرجه الترمذي كتاب الطهارة، باب جاء ما في الوضوء من النوم، رقم الحديث-٧٧، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما.

১০২. আবু দাউদ, হাদীস নং ২০২,

মনে করেছেন। বিশেষ কোন এক বর্ণনা প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ তারা পান নি। তারা উভয়টির মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন ও ঘুমকে কয়েক ভাবে বিভক্ত করেছেন। অর্থাৎ এক প্রকারের ওযু নষ্ট করে আর অন্য প্রকার ওযু নষ্ট করে না।

এমনিভাবে তৃতীয় মাসআলা হলো লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়া। এক জামাত উলামা কেরামের মত হল, কোন অন্তরায় ছাড়া সরাসরি হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। অন্য দলের বিশ্লেষণ উক্ত হুকুম শর্ত ছাড়া নয় বরং এর সাথে সাধ উপভোগের শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ যদি কাম উদ্দিপনার সাথে স্পর্শ করে তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যায় অন্যথায় নয়। তৃতীয় দলের তাহকীক অনুযায়ী হাত দ্বারা স্পর্শ করার কারণে ওযু নষ্ট হয় না। সাহাবা কেরাম রা. এর মাঝেও এই বিষয় নিয়ে মতানৈক্য ছিল এ কারণেই সাহাবা ও তাবেয়ীনদের মাঝে তিনটি মতানৈক্য হয়েছে।

ইমামগণের মধ্যে প্রথম মত ইমাম শাফেয়ী রহ. এর। দ্বিতীয় মত হযরত ইমাম মালেক রহ. এর। তৃতীয় মত হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর। আর ইমামগণের মতানৈক্যের মূল কারণ হল, لمس শব্দের মুশতারাক অর্থ (একাধিক অর্থ)। পবিত্র কুরআনে أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষায় لمس শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সঙ্গম অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে হাত দ্বারা স্পর্শ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের ভিত্তিতেই ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। এক দলের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সহবাস বা সঙ্গম। তাই তাদের মতে উক্ত আয়াত ওযু ভঙ্গকারী কারণ সমূহের অন্তর্ভূক্ত করবে না। আর এটাই হল ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মত। অন্যদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল স্পর্শ করা সুতরাং তাদের মতে এ আয়াত ওযু ভঙ্গকারী কারণসমূহের একটি। তবে এদের মতে এ হুকুমটি ব্যাপক নাকি শর্তযুক্ত। শাফেয়ীদের মতে ব্যাপক কোন শর্তযুক্ত নয়। এ জন্য তাদের মতে এটা দ্বারা অর্থাৎ স্পর্শ করার দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে এটা শর্তযুক্ত । আর সে শর্ত হল কামোদ্দিপনার সাথে স্পর্শ করা। তাদের মতে এ বিষয়ের প্রতি অনেক আছার (বাণী) ও আলামত রয়েছে। সে সকল আছার (বাণী) ও আলামতের ভিত্তিতেই তাঁরা উক্ত আয়াতের অর্থ নির্দিষ্ট করেন। উদাহরণ

স্বরুপ ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর মতে অন্যান্য অনেকগুলো আলামতের মধ্যে এটাও একটি আলামত যে হযরত আয়েশা রা. থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন পন্থায় এ বিষয় প্রমাণিত রয়েছে যে অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত নামায অবস্থায় অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় হযরত আয়েশা রা. এর গায়ে লেগে যেতো আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে নিষেধ করতেন না।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধকারে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করছিলেন সে যুগে চেরাগ বাতীর নিয়ম ছিলো না হযরত আয়েশা রা. কাছে ঘুমিয়ে ছিলেন সেজদায় যাওয়ার সময় হযরত আয়েশা রা. এর পা সামনে ছিলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযরত অবস্থায় পা সরিয়ে দিলেন।[১০৩]

এর দ্বারা বুঝা গেল শুধু স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয় না। আর হানাফী অনুসারীদের মতে হুকুমটা ব্যাপক কোনভাবেই স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না। মালেকী অনুসারীদের মতে কামোদ্দিপনা ছাড়া স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না।

অন্য হাদীসে হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো কোন স্ত্রীকে আদর করতেন এরপর নতুন ওযু করা ছাড়াই নামায আদায় করতেন।[১০৪] এই স্পর্শ করা অবশ্যই কামোদ্দিপনাসহ হয়েছিলো। কেননা, স্ত্রীদেরকে আদর করা সাধারণতঃ কামোদ্দিপনা ছাড়া হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা, ইমামগণের মাঝে

---

[১০৩]. البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة علي الفراش، رقم الحديث-٣٨٢.
ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم الحديث-١١٤٥.
وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، رقم الحديث-٧١٣.
والنسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته، رقم الحديث- ١٦٨، كلهم عن عائشة رضي الله عنها.

১০৩. বুখারী, হাদীস নং ৩৮২, মুসলিম, হাদীস নং ১১৪৫, আবু দাউদ, হাদীস নং ৭১৩, নাসায়ী, হাদীস নং ১৬৮.

[১০৪]. النسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، رقم الحديث-١٧٠، عن عائشة رضي الله عنها.

১০৪. নাসায়ী, হাদীস নং ১৭০.

যে মতানৈক্য তা মূলত হাদীসের ভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। যে বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি। এগুলো ছাড়া কোন বর্ণনাকে প্রধান্য দেওয়ার কারণসমূহ ভিন্ন হওয়া অতিরিক্ত বিষয়।

সারাংশঃ ইমামগণের মতানৈক্যের অন্যতম বড় কারণ হল হাদীসের বর্ণনা যাচাই বাছায়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দুর্বলতার বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে একটি বর্ণনাকে এক ইমাম বিশ্লেষণে সত্য প্রমাণিত করেছেন। তার মতে সেই বর্ণনা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। আর তা থেকে যে হুকুম প্রমাণিত হবে তার উপর আমল করা ওয়াজিব।

আবার অন্য ইমামের নিকট সত্যতার মাপকাঠিতে সেই বর্ণনা পূর্ণতায় পৌছে নাই এ কারণে সেই ইমাম সাহেবের কাছে উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে ঐ বর্ণনা দ্বারা কোন মাসয়ালা প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। বাস্তবে এই মতানৈক্য যথাস্থানে ঠিক রয়েছে। বাহ্যত বিবেক বুদ্ধি বা যুক্তিও এটাকে মেনে নেয়। কেননা, হাদীস শুদ্ধ অশুদ্ধ হওয়ার ভিত্তিই হল হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা আর বর্ণনাকারীদের অবস্থার ক্ষেত্রে যখন মতানৈক্য হয় তখন তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রেও মতানৈক্য হওয়া নিশ্চিত। এর উদাহরণ ঐ অসুস্থ ব্যাক্তি। যে কয়েকজন ডাক্তারের চিকিৎসায় রয়েছে। তন্মধ্যে এক চিকিৎসকের মতে তার অসুস্থতা খুবই মারাত্মক। দ্বিতীয় ডাক্তারের মতে স্বাভাবিক রোগ অর্থাৎ মারাত্মক কোন রোগ নয়। তৃতীয় এক ডাক্তারের মতে অসুস্থতার ধারণাই তার অসুস্থতার কারণ, অন্যথায় সে সুস্থ।

এমনিভাবে একজন বর্ণনাকারী গবেষকের কাছে অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দিত। পক্ষান্তরে অন্যজনের কাছে দ্বীনদার ও সত্যবাদী। এমতাবস্থায় যেমনিভাবে চিকিৎসকদের উপর আক্রমণ করা যাবে না তেমনিভাবে ইমামগণ কাউকে দোষারুপ বা কাউকে সত্যাবাদী আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রেও তাদের উপর কোন আপত্তি করা যাবে না। বরং চিকিৎসকদের মতো বলা হবে হাদীস ও শরীয়তের অনুসারীদেরকে বলা হবে যে, তোমার দৃষ্টিতে যার বিশ্লেষণ ও তাহকীক ভালো লাগে এবং যার উপর তোমার আস্থা বেশী হয় তুমি তারই অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন। সকল পথ্য একত্রিত করে মাজন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

হাদীসের ইমামগণ স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, হাদীস যাচাইকারীদের উদাহরণ হল, স্বর্ণ রুপা পরীক্ষকদের ন্যায়। স্বর্ণ রুপা দেখেই বুঝা যায় যে, এটা খাটি নাকি ভেজাল।

হাফেজ ইবনে হাজর রহ. শরহে নুখবাতুল ফিকার নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, উলূমে হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে জটিল বিষয় হল, মুআল্লাল (হাদীসের দোষক্রটি) এর আলোচনা। এতে দক্ষ ঐ ব্যক্তিই হতে পারে যাকে আল্লাহ তাআলা দোষ বুঝার শক্তি ও ভাল মুখস্ত শক্তি দান করেছেন এবং বর্ণনাকারীদের স্তর ও মর্যাদার পরিচয় এবং সনদ ও মতনের ব্যাপারে দৃঢ় যোগ্যতা রয়েছে। এ কারণে হাদীসের ইমামগণের মধ্যে থেকে খুবই কম সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে কথা বলেছেন। যেমন আলী ইবনুল মাদানী রহ., ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইমাম বুখারী রহ., ইমাম দারাকুতনী রহ., প্রমূখ ইমামগণ। এরপর তিনি বলেছেন যে, হাদীসের দোষ বর্ণণাকারীগণ অনেক সময় দাবীর স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয়। যেমন স্বর্ণ-রুপা পরীক্ষকগণ স্বর্ণ-রুপা যাচাই করতে যেয়ে ভেজালের দলীল পেশ করতে অক্ষম হয়।

এমনিভাবে আল্লামা সুয়ূতী রহ. 'তাদরীবুর রাবী' নামক কিতাবে লেখেন, হাদীসের প্রকার থেকে আঠার প্রকার মুআল্লাল (দোষযুক্ত)। আর এই প্রকারটি সমস্ত প্রকারের মধ্যে খুব সুক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম এবং বিশেষ প্রকারের ভুল মনে করা হয়। এ বিষয়ে কেবল ঐ সব ব্যক্তিগণই ধরতে পারেন যাদের রয়েছে মুখস্ত শক্তি ও পূর্ণ যাচাই করার যোগ্যতা। হাকেম রহ. বলেন, অনেক সময় হাদীস মুআল্লাল (দোষযুক্ত) হয়ে যায় বাহ্যত তাতে কোন দোষ বুঝা যায় না। তালীলের (দোষ নির্ণয় করার) দলীলের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে মুখস্ত শক্তি ও বুঝ শক্তি এবং হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নেই। ইবনে মাহদী রহ. বলেন নতুন দশটি হাদীস অর্জন করার চেয়ে একটি হাদীসের দোষ জানা উত্তম।[১০৫] (তবে এটা সাধারণ মানুষের জন্য নয়)

---

[১০৫]. تدريب الراوي-١/١٣٥

১০৫. তাদরীবুর রাবী-১/১৩৫

আল্লামা নববী রহ. বলেন যে, হাদীসের ইল্লত (দোষ) ঐ সুক্ষ্ম ত্রুটিকে বলে যা অস্পষ্ট, বাহ্যিক হাদীসে কোন ত্রুটি থাকে না। কিন্তু বাস্তবে তাতে গোপনীয়ভাবে ত্রুটি রয়েছে। কখনো বর্ণনাকারী একক হয়ে যাওয়া আবার কখনো অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করার কারণে জানা যায়। আবার কখনো অন্যান্য কারণও এর সাথে মিলে যায়। যেগুলো বিষেশজ্ঞগণ জানতে পারেন। ইবনে মাহদী রহ. এর কাছে কেহ জিজ্ঞাসা করল আপনি কোনো হাদীসকে মুআল্লাল (দোষযুক্ত) আবার কোনো হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এটা আপনি কিভাবে জানেন? উত্তরে তিনি বললেন, যদি তুমি মুদ্রা যাচাইকারীর কাছে কিছু দিরহাম নিয়ে যাও আর সে কিছু দিরহামকে খাদযুক্ত আর কিছু দিরহামকে উন্নত ও ভাল বলে তাহলে কি তুমি তার কাছে জিজ্ঞাসা করো যে, কোন দলীলের ভিত্তিতে আপনি এটা জানতে পারলেন? বাস্তবে হল হাদীসের সাথে অধিক সম্পর্ক এবং সর্বাবস্থায় যাচাই বাছাই করার দ্বারা এই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

আবু যারআ রহ. এর কাছে কেউ জিজ্ঞসা করল যে, আপনি কোনো কোনো হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত বলে দেন এর দলীল কি? উত্তরে তিনি বললেন, আমার কাছে কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো যদি আমি সেটাকে ত্রুটিযুক্ত বলেদেই। তাহলে তুমি ইবনে দারাহ এর কাছে এরপর আবু হাতিমের কাছে জিজ্ঞাসা কর যদি তারা সকলে একই উত্তর দেয় তাহলে বুঝে নিও। লোকে এটা যাচাই করলো ঠিক সেরুপই পেল।

এ ধরণের বিভিন্ন কথা একত্রিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইলমে হাদীসের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারা সবাই এটা ভালো করে জানেন। আমার উদ্দেশ্য ছিলো এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যে, ইমামগণের মতানৈক্য হাদীস ও আছার (সাহাবাদের বাণী) বর্ণনার ভিন্নতার কারণে হতো। যা পূর্বের একাধিক আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এর সাথে সাথে হাদীস ও আছারের শুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক থেকে বিভিন্ন পার্থক্য হয়। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, অনেক নামধারী জ্ঞানীরাও এ ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে রয়েছেন যে, ইমামগণের মতানৈক্য মনে হয় তাদের পরস্পরের বিরোধীতার কারণে হয়েছে। আসল বিষয়টি এমন নয় যে, ইমামগণ দলীল প্রমাণ ছাড়া নিজেদের মনগড়া ইজতিহাদ থেকে কিছু বলে দিয়েছেন। বরং

উদ্দেশ্য হল, ইমামগণের সকল বিষয় হাদীসে নববী থেকে সংগৃহিত। তবে সংগ্রহ ও ইস্তিম্বাতের (মাসয়ালার নির্গত করার) পদ্ধতি ভিন্ন ছিলো।

মোটকথা ইমামগণের মতানৈক্যের অন্যতম কারণ হল, ওই সব হাদীস যেগুলোতে মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে। কোন ইমামের কাছে কোন একটি হাদীসের মাসয়ালা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে আর অন্য ইমামের নিকট উক্ত হাদীসের বিপরিত কোন হাদীসের বর্ণনাকে সহীহ ও অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। আর যখন ইমামগণ হাদীসে বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ডাক্তার ও মুদ্রা যাচাইকারীদের মতো। আর ইমামগণের কাজই হল, বর্ণনাসমূহের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ণয় করা। সুতরাং ইমামগণের কাছে এ কথা জিজ্ঞাসা করা যে, ওমুক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য আর ওমুক বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য কেন? এটা বড় আহমকি ও নির্বুদ্ধিতার আলামত। এজন্য তেরশ বছর পর একথা নিশ্চিত নয় যে, ইমামগণের নিকট বর্ণনা সমূহ ওই সনদে পৌঁছেছে যা আমাদের সামনে রয়েছে। আর এটাও নিশ্চিত নয় যে, আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনার ত্রুটিসমূহ তাদের কাছেও ছিল অথবা ইমাম বুখারী ও মুসলিম উল্লেখ করে দিয়েছেন। বিশেষ করে চার ইমামের স্তর, মর্যাদা ও যমানা সবকিছু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ) এর থেকে অগ্রগামী। আর তারা যখন অগ্রগামী তখন তাদের পরবর্তী ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ)দের সম্পর্কে কি বলার আছে। এরপর তাদের ও পরবর্তী ইমাম দারাকুতনী, ইমাম বায়হাকী (রহ) সহ অন্যান্যদের অবস্থা ইমামগণের সামনে আলোচনা করা কতটুকু যোগ্য? এ কারণেই উপরোক্ত সকল ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরে উচু মর্যদা থাকা ও হাদীসের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোন ইমামের অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। আর থাকার কথাও ছিলো না। কেননা, হাদীসের শব্দ মুখস্ত করা ও হাদীসের সনদ মুখস্ত করা এক বিষয় আর হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করা ও ফিকহী দৃষ্টিতে সে অনুযায়ী আমল করা ভিন্ন বিষয়।

দ্বিতীয় কারণ

বিপরিতমুখী বর্ণনার মাঝে প্রাধান্য দেওয়ার মূলনীতিসমূহে মতানৈক্য

ইমামগণের মাঝে দ্বিতীয় মতানৈক্য হয়েছে বিপরীতমুখী বর্ণনার মাঝে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ সমূহে। যদিও এর আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্বে চলে এসেছে। তারপরও বাস্তবে যেহেতু এটাই ইমামগণের মাঝে মতানৈক্যের অন্যতম বড় একটি কারণ সেহেতু এ বিষয়ে পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাও প্রয়োজন মনে করছি। ইমামগণের মাঝে একাধিক বর্ণনাকে সহীহ মেনে নিয়ে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ সমূহের মাঝে ও মতানৈক্য হয়েছে অর্থাৎ ভিন্ন দুই বিষয়ের মাঝে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ কি হতে পারে। এর বর্ণনাও অনেক দীর্ঘ। আর চার ইমামের কিতাব অধ্যায়ন করার দ্বারা এর বিস্তারিত হাকীকত স্পষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি,

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ রহ. বলেন, এক বার এক বাজারে আবু হানীফা ও আওযায়ী রহ. এর কথা হল, ইমাম আওযায়ী রহ. ইমাম আবু হানীফা এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে উঠার সময় কেন হাত উঠান না? ইমাম আবু হানীফা রহ. উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এর প্রমাণ সহীহভাবে প্রমাণিত না। আওযায়ী রহ. তিনি যুহরী, তিনি সালেম থেকে, তিনি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠাতেন। ইমাম আওযায়ী রহ. এর উত্তরে ইমাম আবু হানীফা রহ. একটি হাদীস শুনিয়ে দিলেন যে, হাম্মাদ তিনি, ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদ থেকে তাঁরা উভয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায আদায় করতেন তখন শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন।' এর উত্তরে আওযায়ী রহ. বললেন, আমি যে সনদে হাদীসটি বর্ণনা করলাম অর্থাৎ যুহরী, তিনি সালেম থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে এ সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত তিনটি

মাধ্যম মাত্র। আর আপনি সনদ বর্ণনা করলেন, অর্থাৎ হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আলক্বমা ও আসওয়াদ থেকে, তাঁরা দুইজন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে, এ সনদে মাধ্যম চার জন। তখন ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, হাম্মাদ যুহরী থেকে বেশী ফকীহ ছিলেন। আর ইবরাহীম সালেম থেকে বেশী ফকীহ ছিলেন। আলক্বমাহও ইবনে উমর রা. থেকে নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে কম গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তবে ইবনে উমার রা. সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন আলক্বমারও অন্যান্য অনেক ফযীলত রয়েছে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রা. কথা তো বাদই দিলাম। এরপর আওযায়ী রহ. চুপ হয়ে গেলেন।[১০৬]

ইবনে আরাবী রহ. তিরমিযীর শরাহে লেখেন, যদি কখনো ইবনে উমার ও ইবনে মাসউদ (রা.) এর মাঝে কোন বিষয়ে দ্বন্দ হয় তাহলে ইবনে মাসউদ রা. কে প্রাধান্য দিতে হবে।

উক্ত বিতর্ক উল্লেখ করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো উক্ত ইমাম দ্বয়ের প্রাধান্য দেওয়ার কারণ সমূহ বর্ণনা করা। কেননা আওযায়ী রহ. ও অন্যান্য শাফেয়ীদের মতে কম মাধ্যম বিশিষ্ট সনদ প্রাধান্য পাওয়ার ও যোগ্য অগ্রগণ্য। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে বর্ণনাকারী ফকীহ হওয়ার দ্বারা প্রাধান্য পায়। আর হানাফীদের মতে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ সমূহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটাও যে, যখন একাধিক বর্ণনার মাঝে দ্বন্দ হয় তখন ফকীহ বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে তাঁরা প্রাধান্য দেয়। বিষয়টি যুক্তিযুক্তও। কেননা মানুষ যত বুঝমান হবে কথা তত পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণনা করতে পারবে। এমনিভাবে ইমাম মালেক রহ. এর মতে মদিনাবাসীরা যদি কোন বর্ণনা অনুযায়ী আমল করে তাহলে তা প্রাধান্য পাওয়ার কারণ হবে। অর্থাৎ যদি কখনো দুই বর্ণনার মাঝে দ্বন্দ হয় তাহলে যেই বর্ণনা অনুযায়ী মদীনাবাসীরা আমল করে আসছে সেই বর্ণনাকে তাঁরা প্রাধান্য দেয়। 'মুওয়াত্তা ইমাম মালেক' যা দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায়। ইবনে আরাবী মালেকী রহ. তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লেখেন যে, ইমাম মালেক রহ. এর নীতি হলো যখন কোন হাদীস মদীনাবাসীদের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তখন তা যাচাই এর উর্ধ্বে উঠে যায়।

---

[১০৬] . إعلاء السنن، كتاب الصلاة،باب ترك رفع اليدين في غير الافتتاح، ٧٥/٣، طبع الباكستان.

১০৬. ই'লাউস সুনান, কিতাবুল সালাত ৩/৭৫ (পাকিস্তান হতে প্রকাশীত)।

যে সকল কারণে একাধিক হাদীসের মাঝে কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেগুলো অনেক বেশী। হাযেমী রহ. 'কিতাবুল নাসেখ ওয়াল মানসুখ' এ এমন ৫০টি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো দ্বারা দ্বন্দপূর্ণ দুই হাদীসের মাঝে কোন একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়।

আর ইরাকী রহ. 'কিতাবুন নুকাত' এ ১০০ টির চেয়েও বেশী কারণ উল্লেখ করেছেন। এগুলো সবগুলোর ব্যাপারে ঐক্যমত নেই। হাদীস অনুযায়ী আমল কারীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, সে সবগুলোর তাহ্কীক করার পর এটা দেখা যে, কোন হাদীসে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ বেশী পাওয়া যায়। যাতে করে সে অন্যান্য দ্বন্দপূর্ণ হাদীসের উপর এটাকে প্রাধান্য দিতে পারে। এ জন্য হানাফীগণ ঐ সকল হাদীসকেও প্রাধান্য দেন যেগুলোর সনদ শক্তিশালী বা উঁচু স্তরের। আর এগুলোর কারণে প্রাধান্য পাবে না কেন? কেননা এর চেয়েও প্রাধান্য দেওয়ার শক্তিশালী কারণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ হানাফীদের মতে প্রাধান্য দেওয়ার শক্তিশালী অন্যতম কারণ হলো কোন হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআনের শব্দের অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। আর এটা খুবই স্পষ্ট বিষয়। কেননা হাদীসের শব্দ সমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দ হওয়া নিশ্চিত নয়। রাবীদের কর্তৃক অর্থ ঠিক রেখে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করার আলোচনা পূর্বে চলে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআনের শব্দ সমূহ হুবহু বর্ণিত হওয়া নিশ্চিত। এজন্য বিভিন্ন হাদীসের বিষয় বস্তুর মাঝে যে বিষয় বস্তু কুরআনের শব্দের বেশী নিকটবর্তী বুঝা যাবে উহা প্রাধান্যশীল হওয়া নিশ্চিত ও স্পষ্ট কথা। এ কারণে হানাফীগণ রাফে'ইয়াদাইন (নামাজে হাত উঠানো) সম্পর্কে বর্ণনাসমূহের মাঝে ঐ সকল বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন যেগুলো রাফে'ইয়াদাইন (নামাজে হাত উঠানো) বুঝায় না। কেননা কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

এই আয়াতের শব্দের অর্থ হলো চুপ স্থীর হয়ে নামাজ পড়া। এই ভিত্তিতে এমন যত বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর কোন একটিতে স্থীরতার কাছাকাছি পাওয়া যাবে সেই বর্ণনাটি হানাফীদের মতে প্রাধান্য পাবে। বিভিন্ন ঘটনা দ্বারাও এটার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন প্রথম দিকে নামাজে

অনেক আমল যেমন কথা বলা, আলাপ করা, ইত্যাদি সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয ছিল।

পরবর্তীতে ধীরে ধীরে স্থীরতার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। এজন্য যে কোন দ্বন্দপূর্ণ দুই বর্ণনা থেকে যে বর্ণনাটি স্থীরতার কাছাকাছি হবে সেই বর্ণনাটিই হানাফীদের মতে প্রাধান্য পাবে। আর এজন্যই হানাফীদের মতে ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়া সম্পর্কে দ্বন্দপূর্ণ বর্ণনার ঐ সকল বর্ণনাকে প্রাধান্যযোগ্য যেগুলো ক্বেরাত পাঠ না করা সম্পর্কে বুঝায়। কেননা কুরআনের আয়াত وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا

অর্থাৎ আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক।[১০৭] এই আয়াতের অধিক নিকটতম। এজন্য হানাফীদের মতে ফজর ও আছরের নামাজ বিলম্ব করে আদায় করা উত্তম। কেননা قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا অর্থাৎ সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে। এই আয়াতের অধিক নিকটতম। এজন্য যে, সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে কেবল ঐ সময়কেই বলা হবে যখন তা নিকটবর্তী হবে। কেননা সূর্যাস্তের তিন-চার ঘন্টা পূর্বে পৌছার ক্ষেত্রে কেউই বলে না যে, আমি সূর্য উদয়ের পূর্বে পৌছে যাব। এজন্যই হানাফীদের মতে বেতর নামাজে দো'আয়ে কূনূতে اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ দু'আকে প্রাধান্য দেয়। কেননা কুরআন শরীফে দুই সূরা পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের হাজারো উদাহরণ আছে দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় সেগুলো উল্লেখ করছি না। কিন্তু হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য বর্ণনার দুর্বলতার কারণ সমূহ এবং প্রাধান্য দেওয়ার কারণ সমূহ জানা একান্তই জরুরী। এটা ছাড়া বর্ণনা অনুযায়ী আমল সম্ভব নয়। আমি আমার ছাত্র জীবনে ইমামগণের উসূল জমা করা এবং প্রাধান্য দেওয়ার একাধিক কারণ একত্রিত করা শুরু করেছিলাম। কিন্তু সময়ের অভাবে পরিপূর্ণ করতে পারি নাই। والله الموفق

---

[১০৭] . سورة الأعراف-٢٠٤.

১০৭. সূরা আরাফ আয়াত নং-২০৪

পরিশিষ্ট

এ বিষয়ে আরো বেশী লেখা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে পান্ডলিপি এ টুকুই পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত লিখার পর উপায় উপকরণের অভাবে 'আল-মুযাহের' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বন্ধুবান্ধদের অনেক পিড়াপিড়ির ফলে এ বিষয়টি পূর্ণতা দান করা সম্ভব হয়। আমারও আগ্রহ ছিলো এজন্য বিষয়বস্তু যতটা আমার স্মরণে ছিলো তা অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত এবং চার থেকে পাঁচ শত পৃষ্ঠা লেখার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যস্ততায় এটা পূর্ণ করার সুযোগ হয় নি। আর এটা অপূর্ণ হওয়ায় কখনো ছাপানোর ইচ্ছা ছিলো না। যদিও অনেক বন্ধুবান্ধব পীড়াপিড়ি করেছিলো আর আমি বার বার বলেছিলাম যে, এটা তো প্রাথমিক ও অসম্পূর্ণ বিষয়। কিন্তু ১৩৯০ হিজরীতে আমার হেজাজ সফরে শাহেদ সেই পৃষ্ঠাগুলো না জানি কোথা থেকে সে তালাশ করে নিলো তখনও ২/১টি লিখিত অংশ পাওয়া যাচ্ছিলো না। এগুলো তালাশ করে এনে ছাঁপানোর জন্য পিড়াপিড়ি করলো ও বললো এটুকুই অনেক জরুরী ও অনেক উপকারী হবে। অন্যদিকে আমার মুখলেছ বন্ধুরা মুফতী মাহমুদ, মাওলানা ইউনুস, মাওলানা আক্কেল, মাওলানা সালমান সাহেব সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সকলেই এটা ছাঁপানোর জন্য জোড় অনুরোধ করলেন। এজন্য আমি প্রিয় শাহেদকে অনুমতি দিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও পাঠকদেরকে উপকৃত করুন।

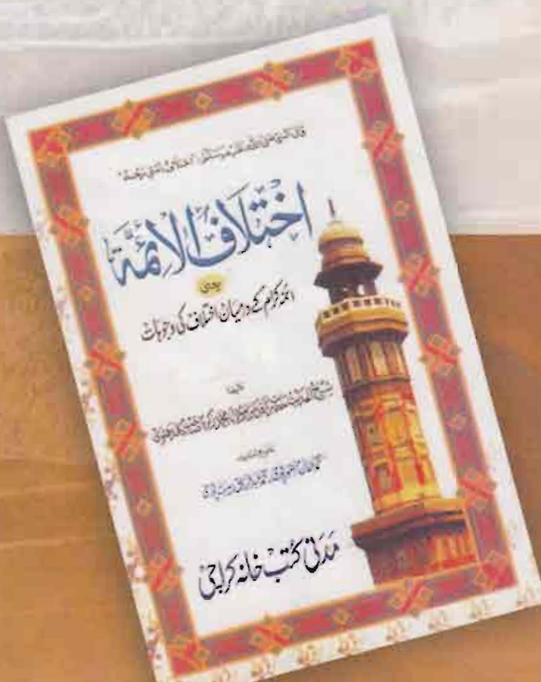
(শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা) মুহাম্মদ যাকারিয়া (মুহাজিরে মাদানী রহ.)

আমাদের প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১। মাহমূদুস সুলূক মূলঃ কুতুবুল ইর্শাদ হযরত মাঃ রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ)
২। আল্ এ'তেদাল ফী মারাতিবির রিজাল বা ইস্লামী সিয়াসাত
মূলঃ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ)
৩। আকাবের কা তাকওয়া "
৪। আকাবের কা সুলূক ও ইহ্সান "
৫। আকাবের কা রমাজান "
৬। শরীয়ত ও তরীকত "
৭। যিকির ও এতেকাফের গুরুত্ব
৮। তারবীয়াতুল তালেবীন মূলঃ মুফতী আজম মুফতী মাহমুদ সাহান গাঙ্গুহী (রহ.)
৯। হুদুদে এখতেলাফ ঃ "
১০। হেদায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মূলঃ শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওঃ ইবরাহীম সাহেব। (দা.বা.)
১১। দাওয়াত-তাবগীব ও পীর-মুরীদী
মূলঃ শায়খুল মাশায়েখ শায়খুল হাদীস হযরত মাওঃ মামুন রশীদ সাহেব (দা.বা.)
১২। ইসলামী দাড়ী ও পোশাক "
১৩। মহিলাদের আমালে যিন্দেগী মূলঃ মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াছ
১৪। তাযকিরাতুল ইহসান (আরবী) "
১৫। সহজে সহী শুদ্ধভাবে কুরআন ও নামায শিক্ষা "
১৬। আল্লাহ প্রেমিকগণের জন্য আল হেজবুল আজম (অর্থসহ,) দরুদ শরীফ, হেজবুল কুরআন ও মন্‌জিল বা ৩৩ আয়াত সাপ্তাহিক দোয়ার অজীফা।
১৭। হযরতজী মাওঃ ইলিয়াস রহ. এর মালফূজাত
১৮। সমবেত হয়ে জোরে যিকির করা সুন্নত হওয়ার প্রমাণ
মূলঃ মাওলানা আব্দুল হাফীজ মাক্কী দা.বা.
১৯। মাওয়ায়েজে শায়েখ ইবরাহীম আফরিকী।
২০। সতী নারীর সুখ ও হাদীসের আলোকে ছয়জন হতভাগিনীর কাহিনী।
মূলঃ হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব দা.বা. ও
হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রউফ সাখরাভী দা.বা.

মাকতাবাতুয যাকারিয়া
মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬
مكتبة زكريا

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইমামগণের মতবিরোধের কারণ এবং এ মতবিরোধ কি ও কেন? এ বিষয়ে এক অদ্বিতীয় কিতাব। এ কিতাবটি হাদীস ও মাসায়ালার কিতাব পড়ার পূর্বে পড়ে নিলে কিতাব বুঝতে বড় সহায়ক হয়।



Design : **An-Noor.** 01712510726, 01670837659

মাকতাবাতুয যাকারিয়া
ব্লক-ডি, রোড-২০, বাসা-৩৪, মিরপুর-৬
ঢাকা-১২১৬, মোবা : ০১৭১২৯৫৯৫৪১